আগমনী

Agomoni ২০২১

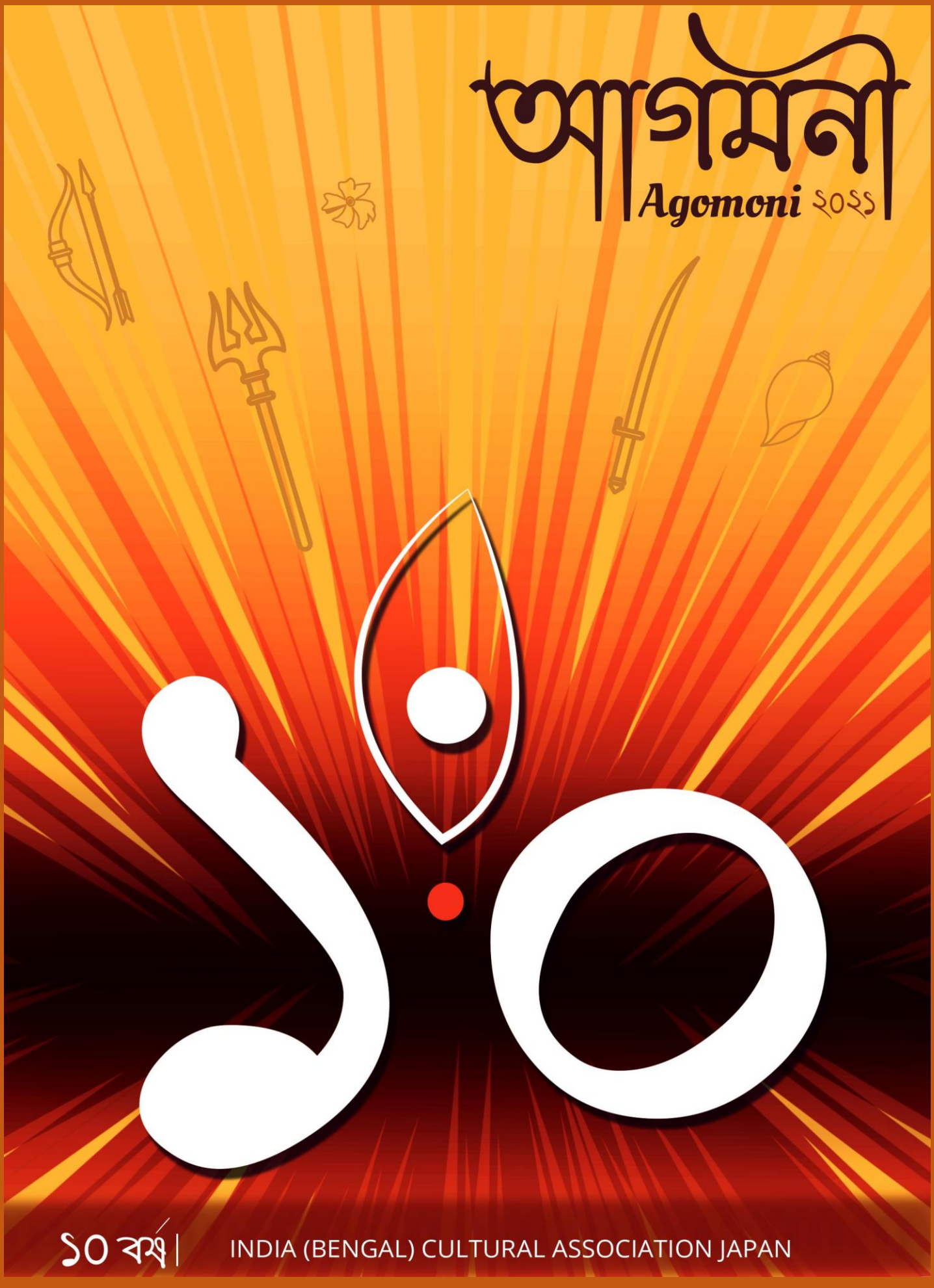

১০ বর্ষ | INDIA (BENGAL) CULTURAL ASSOCIATION JAPAN

AGOMONI-2021 (Volume-9)

Editorial Team

Rajarshi Dasgupta, Pallab Sarkar, Naba Gopal Roy, Paromita Roy

Cover Design

Front cover: Paromita Roy

Back cover: Sukanya Misra

[*With a storm raging in our hearts, we look to the horizon. Separated from our kin and motherland by the tumultuous seas and tumultuous time that we find ourselves in. We are graced by the sun as we stand in the land where it rises. The red rising sun will bring with it a new dawn. The rising sun will raise our spirits and cleanse this world of malign. The rising sun unites us with our near ones afar, as we are all children under the same red sun. The storm clouds are scattering and it is getting clearer. Our Mother, our strength, our life force surrounds us. Ma Durga is here****.]***

© All rights are reserved

https://ibcaj.org/
https://www.facebook.com/ibcaj

সম্পাদকীয়

"তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে..."

এক অদ্ভুত অন্ধকার সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। চারপাশে মৃত্যু মিছিল, স্বজন হারানো মানুষের আর্তনাদ। অফিস কাছারি নেই। স্কুল-কলেজ নেই। উৎসবের আতিশয্য নেই। সামাজিক দূরত্বের সাথে পাল্লা দিতে দিতে আমরা সবাই বড্ড ক্লান্ত আর ভীষণ একা । শাপমুক্তির খোঁজে দিন গুনে চলেছি অবিরাম। আশার কথা একটাই, জাপান তথা সারা বিশ্বে বিপুল পরিমানে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়ে চলেছে । ঈশ্বর করুন করোনা মহামারীর এই দুর্দিন যেন দ্রুত ফুরিয়ে আসে ।

অনেক বাধা, বিপত্তি উপেক্ষা করে আমাদের দুর্গা পুজো এই বছর ১০ বছর পূর্ণ করল । প্রবাসে কিছু মানুষের একত্রিত হওয়ার ইচ্ছে থেকে যার উৎপত্তি, দশক শেষে সেই পুজোই টোকিও তথা জাপানের অন্যতম শারদ উৎসবের স্বীকৃতি পেয়েছে। এ আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের এবং আনন্দের। এই রকম একটি মাহেন্দ্রক্ষণে করোনা মহামারীর সমাপতন নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক এবং হতাশাব্যঞ্জক । তবু কবির ভাষায়

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে/
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে"।

তাই এই সংকট কালেও মাতৃবন্দনায় ব্রতী আমরা, অবশ্যই সকল স্বাস্থ্য বিধি মেনে । আর হবে নাই বা কেন, দেবী তো দুর্গতিনাশিনী, মহামায়া, ত্রিনয়নী ।

আমাদের শারদ উৎসবের অন্যতম অঙ্গ - আগমনী । অন্যবারের মতো এইবার ও আমরা হাজির হয়েছি সাহিত্য-শিল্পের নৈবেদ্য নিয়ে। প্রবাসের নৈশদ্ধে আর একাকিত্বে যাদের জন্ম। করোনা মহামারীর কারণে প্রস্তুতিতে কিছু খামতি থাকলেও , উৎসাহে খামতি নেই। উপরি পাওনা কলকাতার স্বনামধন্য কিছু লেখকের লেখা , যা নিঃসন্দেহে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে গৌরবান্বিত করেছে। তাদের সকলকে আমাদের অনেক ধন্যবাদ, শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক অভিনন্দন।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয়। বিগত দশ বছরে বহু মানুষের সান্নিধ্য এবং সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। তাদের অনেকেই হয়তো আজ দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছেন। তাদের সকলকে আমাদের নমস্কার আর শুভেচ্ছা। করোনা পরবর্তীকালে তাদের সাথে আবার নিশ্চয় দেখা হবে। ততদিন ভালো থাকার, সুস্থ থাকার অঙ্গীকার টুকু থাক । আবার শান্ত হোক পৃথিবী। শান্তিরূপেণ সংস্থিতা, মঙ্গলময়ী দেবীর, মাতৃ স্নেহছায়ায়।

সূচিপত্র

	Title	Author	Page
1	আমার স্মৃতির পুজো	পবিত্র সরকার	5
2	রসমঞ্জরী	সৈকত রক্ষিত	8
3	প্রেমের নদী আন্ধারমানিক	সেলিনা হোসেন	21
4	অন্ধ বালিশ	শ্যামল ভট্টাচার্য	26
5	দীনুবাবু	সাগর বিশ্বাস	31
6	Code Name Silver	শুভব্রত মুখার্জী	36
7	রেল লাইন	রাজর্ষি দাশগুপ্ত	38
8	বিহারে ভ্রমণ	পার্থ প্রতিম ব্যানার্জী	40
9	হঠাৎ খুশি	অনিন্দিতা দত্ত	46
10	দুলুদা	সুশান্ত ভট্টাচার্য্য	47
11	কবিতা (শরৎ / ইচ্ছেডানা)	সুব্রত সেনগুপ্ত	48
12	কবিতা (পুজোর খুশি/"মেঘবালক")	শ্রীপর্ণা রায় চৌধুরী	49
13	কবিতা (তুমি শেষ কবে চিৎকার করেছিলে)	প্রত্যূষা সরকার	50
14	নবদুর্গা	কেয়া ভট্টাচার্য্য	51
15	কবিতা (তুম অপরাজিতা)	খুশী বর্মা	55
16	কবিতা (অগলী ছুট্টী)	নিতিন শ্রীবাস্তব	55
17	Recipe Corner	Anindita Datta	56
18	10 Years of IBCAJ	Soumya Dutta	58
19	About Us	IBCA Team	59
20	Message from Ex-members	--	63
21	Balance sheet and Our sponsors		64-71

FROM THE PRESIDENT'S DESK

Dear Readers

Another memorable year has just passed by after the publication of Agomoni 2020. We all have seen many ups and down in our own life as well as in our collective lives. We fought together during the tough time, shared our joy and agonies and have never given up. Tough time made us even stronger and taught us many important and larger lessons of life. Finally, the time has come to celebrate the Holy Durga Puja and yet another publication of Agomoni 2021.

Incidentally, this is our 10th year of Durga Puja in Tokyo. India`s diversified culture and festivals bring all the communities together, thus, pay a pivotal role in building a strong community. Durga Puja is certainly one of the main festivals not only for Bengalis but also for the entire nation.

Owing to COVID restrictions, we were in dilemma whether we can celebrate Durga Puja in Tokyo. It was never an easy task. We are constantly in touch with the hall management, local government, Tokyo city government and following up each restriction, rules, dos, don'ts, etc. Truly, we have been getting ample support from each of them and only because of their kind support; today we are celebrating the Durga Puja.

Like other previous years, this celebration of Durga Puja in Tokyo comes with the publication of the much-awaited annual Magazine, "AGOMONI". Due to limited logistics and other restrictions, we are not able to publish the print version of this ninth edition, and the web-only version is made available to our readers. However, I must express my sincere thanks and gratitude to all editorial members of Agomani and contributors for their hard work in making it possible to publish this magazine, even during these difficult times.

It's also an immense pleasure to note and convey to you all that every year we have some new members joining in our this India(Bengali) Cultural Association Japan (IBCAJ). Their fresh energies and enthusiasms help us to be more active, productive and remain strong & young in any given condition.

Finally, I would like to express my deepest gratitude to The Indian Embassy in Japan for their constant support and guidance. I would also like to thank all of our sponsors, for their cordial support and for always being with us.

Last but not the least, on this auspicious occasion; Let us pray to Maa Durga for our good health, prosperity and a better tomorrow.

HAPPY DURGA PUJA to all of you.

Date: 5th October 2021

Place: Tokyo

Naba Kumar Ghosh

(President, IBCA Japan)

Mayank Joshi
Charge d' Affaires a.i.

Embassy of India, Tokyo
भारत का राजदूतावास, टोक्यो

Message

I am delighted to extend my warm wishes and congratulations to the India (Bengal) Cultural Association in Japan (IBCAJ), in their efforts to organise the Durga Puja festival in Tokyo on October 10, 2021.

2. Durga Puja, one of the most awaited festivals of India, especially in the state of West Bengal, epitomizes the victory of good over evil. It is a symbolic reminder of human interdependence with nature. It is in part, a harvest festival, celebrating the goddess as the motherly power behind all of life and creation. The Durga Puja festival is a collective occasion for promoting cultural & people-to-people linkages between India & Japan.

3. I congratulate IBCAJ for their annual literary e-magazine **"Agomoni".** The community & friends of India in Japan eagerly look forward to Agomoni every year. The e-magazine is a treasure of wonderful literary expressions & artful experiences shared by talented contributors.

4. On this auspicious occasion, I convey my best wishes to my fellow Indians and Japanese friends for good health, prosperity and happiness.

Mayank

(Mayank Joshi)

Tokyo
01st October 2021

Embassy of India, 2-2-11 Kudan Minami, Chiyoda-ku, Tokyo 102 0074
Telephone : +81-3-3262-2391 to 97 Fax : +81-3-3234-4866 https://www.indembassy-tokyo.gov.in

আমার স্মৃতির পুজো

পবিত্র সরকার

আমার স্মৃতির পুজো মানে দেশভাগের আগে আমার গ্রামের পুজো। সেটা মহানগরের আলো-বাদ্য-সংগীত-লোকারণ্য- অভিনন্দিত পুজো নয়, শত-প্রতিযোগিতার 'শ্রেষ্ঠ', 'সেরা', 'সম্মানিত' 'পূজাশ্রী' ধরনের হাজার পুজো নয়। টিমটিম করা একটিমাত্র পুজো, কিন্তু তাই নিয়েই আমাদের বিপুল উৎসব-উৎসাহ, আনন্দের মাতোয়ারা উচ্ছ্বাস। বর্ষার শেষ হতেই শিউলির গন্ধে সেই পুজোর অগ্রিম সংবাদ এসে পৌঁছোত, বাগানে দোপাটির বনে ফড়িং আর প্রজাপতিরা উড়ে বেড়াত, আকাশের সাদা মেঘের টুকরোগুলো ঠিকানাহীন স্বেচ্ছাচারে ভেসে বেড়াচ্ছে, কখনও বা একটু হঠাৎ মেঘলা হয়ে রামধনু উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা জেলার সেই সুদূর গ্রামের কোল ঘেঁষে বয়ে যাওয়া আমাদের বংশাই (ভালো নাম বংশী) নদীতে নানা রঙের বাতাস-ভরা পাল তোলা নৌকো আসছে। বেশির ভাগ নানা পসরার নৌকো, কিছু আসছে যাত্রী নিয়ে। কাশফুলে ছেয়ে যাচ্ছে নদীর ধার আর গ্রামের মাঠঘাট।

ওই যে যাত্রীবাহী নৌকোগুলো আসছে নদী বেয়ে, সেই নৌকার সঙ্গে আমাদের গ্রামের পুজোর একটা গভীর সম্বন্ধ ছিল। সেগুলো ছিল গহনার নৌকো, আমরা বলতাম 'গয়নার নৌকা'। অনেকটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের মতো। তাতে করে আসতেন শহরে দূর প্রবাসে চাকরি-করা গ্রামের মানুষজন। এই পুজো উপলক্ষ্যে বছরে তাঁদের একটিবার গ্রামে আসা—তাঁরাও উন্মুখ হয়ে থাকতেন এই উপলক্ষ্যটার জন্যে। তখন একটা মোটর লঞ্চ চালু হয়েছে ঢাকা থেকে, কখনও মোটর লঞ্চেও আসতেন তাঁরা। আমরা দৌড়ে দৌড়ে ঘাটে যেতাম লঞ্চ আর গহনার নৌকার সময় বুঝে—দেখি আজকে কারা এল। ওই তো এসেছেন অমুক জ্যাঠামশাই আর তাঁর পরিবার। আহ্, কী সুন্দর পোশাক তাঁদের ছেলেমেয়েদের, তাদের গায়ে শহরের কী চমৎকার গন্ধ, তাদের পোশাক কী সুন্দর, যেন তারা আমাদের গ্রামের কেউ নয়, তারা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে ! এই এলেন আমার নিজের খুড়তুতো দিদি আর জামাইবাবু। এঁরা এলে আমাদের খুশি লাফিয়ে উঠত আকাশে, কারণ জামাইবাবু আমাদের জন্যে নিয়ে আসতেন বই, জামাকাপড়, শহুরে বিস্কুট আর চকোলেট, এবং গ্রামে তখনকার দুর্লভ এক বস্তু, কন্‌ডেন্স্‌ড মিলক—তার নাম বোধ হয় ছিল 'অস্টারমিল্ক'। তিন ফুটো করে সেই ঘন দুধ জামাইবাবু আমাদের হাতে ঢেলে দিয়ে বলতেন, 'খাও'। আহা, অমৃতের স্বাদ গড়িয়ে যেত আমাদের পাকস্থলী পর্যন্ত।

গ্রামে আমাদের মা-মাসি-পিসিরা অবিশ্যি অনেক আগে থেকেই পুজোর প্রস্তুতি নিতেন। বর্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতাম উঠোনের একধারে শুকনো নারকেলের স্তূপ জমা হচ্ছে। তারপর একদিন একজন-দুজন মুনিস এসে সেগুলো ছাড়িয়ে দিল, ছাড়ানো নারকেল বারান্দায় তোলা হল। তারপর নারকেল ভাঙার দিন আমাদের ডাক পড়ল নারকেলের জল খাওয়ার জন্যে, আমরা মহানন্দে পেট পুরে নারকেলের জল খাওয়ার উৎসবে মাতলাম। তারপর বাড়ির বউরা কুরুনি নিয়ে বসে সেই নারকেলের করার স্তূপ তৈরি করল থালা বা কলাপাতায়। এবং পরক্ষণেই মা-কাকিমা-বিধবা পিসিরা তার নাড়ু, 'তক্তি', সন্দেশ তরি করতে লেগে গেলেন। রান্নাঘর তো নয়, মনোরম ভোজ্য উৎপাদনের কারখানা যেন ! আহা, গরম এখো গুড় আর ভাজা নারকেল-কোরার গন্ধে সারা বাড়িটা 'ম-ম' করতে শুরু করল। আমাদের রান্নাঘরের সীমানা ছেড়ে নড়ায় কার সাধ্যি। আমরা যে বঞ্চিত থাকতান তা নয়। পুজোর ভোজ এই তো শুরু হল !

গ্রামের পুজো বারোয়ারি হলেও এক এক বছর এক এক বর্ধিষ্ণু গেরস্থের বাড়িতে পুজো হত। সেখানে মাসখানেক আগে থেকেই দেখতাম প্রতিমার বাঁশ আর কাঠের কাঠামো তরি হচ্ছে। এক সময় খড় বেঁধে বেঁধে প্রতিমার আদল তৈরি হল, তখন তাকে প্রতিমার কঙ্কালের মতোই লাগত। যদিও বাড়ির কোথাও একটা—শূন্য গোয়ালঘরে বা ঢেঁকিশালায়—একটা পাতলা চটের পর্দা টাঙিয়ে প্রতিমা তৈরি হত, আমাদের তা দেখার কোনো বাধা ছিল না। আমাদের প্রতিমা চোখের সামনেই তৈরি হত, আমাদের কোনো কুমোরটুলি ছিল না। তার পর একদিন খড়ের কাঠামোর ওপর মাটি পড়ত, প্রতিমার নিরাবরণ শরীর দাঁড়াত চোখের সামনে। তাদের মাথার চুলও থাকত না। আর আমাদের প্রতিমা ছিল সপরিবার একই চালচিত্রের নীচে—লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ অসুর সিংহ কেউ আলাদা আলাদা থাকতেন না। ও সব শহুরে কেতা আমাদের গ্রামের কুমোররা তখনও শেখেননি।

তারপর একদিন তাদের ওপর একটা সাদা রঙ পড়ত, এখনকার ভাষায় 'প্রাইমার'। আস্তে আস্তে অতসীফুলের রঙ দেওয়া হত। ঠোঁটের আর হাতের লাল রঙ, পায়ের আলতা, নখের লাল, কার্তিকের কালো জুতো, গণেশের শুঁড়ের ভাঁজ আর সামনে লাল রঙ,—আস্তে আস্তে দেবদেবীদের মূর্তি ফুটে উঠতে থাকত। তাদের মাথায় কালো রঙ করা শণপাটের চুলও পরানো হত এই সময়। কিন্তু দেবীর 'চোখ' আঁকা আমরা দেখতে পেতাম না, বোধ হয় মধ্যরাত্রে পর কুমোর কোনো শুভক্ষণ দেখে দেবীকে 'চক্ষুদান' করতেন।

আমরা অধীর অপেক্ষায় থাকতাম কবে স্কুলের ছুটি হবে। আমাদের ধৈর্যকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে সেই ছুটিটা বোধ হয় হত পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিন। তার পর আমাদের আর পায় কে ? না খেয়ে না দেয় পুজোমণ্ডপে পড়ে থাকার পর্ব শুরু হল। পুজোর ছুটির পরেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা, কিন্তু গুরুজনরা এক স্বর্গীয় উদারতায় বলেই দিতেন পুজোর ক-দিন বই ধরবার দরকার নেই, এমনকি বই ধরলে তা নাকি পাপ। সে পাপ আর কে করতে যায় ! বই না-পড়ার পুণ্যসঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক মহাভোজে অংশগ্রহণ—সকালে লুচি ও নতুন ওঠা ফুলকপির ছেঁচকি, কোনো দিন পিঠে-পায়েস, দুপুরে রাত্রে সপ্তব্যঞ্জন। ভাতে গাওয়া ঘি, প্রচুর ভাজাভুজি, শরতের অজচ্ছল মাছ, নানাবিধ তরকারি, চাটনি, দই, সন্দেশ, এবং নবমীর দিন অবধারিতভাবে নধর খাসির মাংস। এই সব খাবার খাওয়ার জন্যেও আমাদের পুজোমণ্ডপ থেকে বার বার ডাকাডাকি করে টেনে আনতে হত, আমরা খুবই অনিচ্ছাসত্ত্বে বাড়িতে ফিরতাম। এর সঙ্গে যদি বিজয়ার খাদ্য-অভিযানের কথা যোগ করি, তাহলে পাঠকেরা আর আমাকে ক্ষমা করবেন বলে মনে হয় না। আমার পেটের সহনশক্তিও আজকাল আর তেমন নেই।

তখন তো এখনকার মতো 'জলসা' ছিল না, অমুক-কণ্ঠী তমুক-কণ্ঠী শিল্পীদেরও উদয় হয়নি আমাদের সাংস্কৃতিক দিগন্তে। পুজোয় ছিল থিয়েটার। গ্রামের দাদা ও কাকারা অনেক আগে থেকেই তার মহড়া শুরু করে দিতেন। বেশিরভাগ সময়েই কলকাতার স্টেজের কোনো সফল নাটক, 'দেবলাদেবী', কিংবা 'সাজাহান' কিংবা 'রাতকানা'। আমরা লুকিয়ে চুরিয়ে রিহার্সাল দেখাবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু আমাদের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। ওটা বড়দের ব্যাপার। নায়িকা বা স্ত্রীচরিত্রে পুরুষেরাই

অভিনয় করতেন, তাঁদের ভারী গলাকে কীভাবে দুমড়ে-মুচড়ে মেয়েদের মতো মিহিকরে ফ্যালবার চেষ্টা করছেন তা দেখে আমাদের হাসি পেত।

এর ফলে যেটা হত, বিজয়া দশমীর বা কালীপূজোর দুদিন পরে যখন সেই থিয়েটার হত তখন অবধারিতভাবে স্ত্রী-অভিনেতাদের দু-একজনের গলা বসে যেত, গলা দিয়ে ফ্যাশফ্যাশ আওয়াজ ছাড়া কিছু বেরোত না। বউদি বা কাকিমারা প্রাণপণ চেষ্টা করতেন আদা-চা করে দিয়ে সেই গলা মেরামত করতে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো সুরাহা হত না। ফলে থিয়েটারের দিন নায়িকার ভাঙা গলায় 'প্রাণনাথ' এবং প্রেমের সংলাপ চ্যাংড়া দর্শকদের মধ্যে মাঝে মধ্যে মৃদু হাসির ঢেউ তুললে, গ্রামের প্রবীণরা বজ্রগম্ভীর স্বরে ধমকে উঠতেন 'সাইলেন্স !' বলে। নাটক তবু মুগ্ধ হয়ে দেখত চারপাশের দশখানা গ্রাম থেকে আসা গ্রামের লোক।

এই ছবিটা আমার চোখে এখনও লেগে আছে। দূর গ্রাম থেকে দর্শক এসেছে হারিকেন নিয়ে। সেই হারিকেন নিয়ে তারা নাটকের শেষে দূরের ধানখেতের মাঝখানকার আলপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, মাঠের ওপর ভারী হয়ে থাকা অন্ধকার দোলাতে দোলাতে।

তবে এই কাব্যিক দৃশ্যেই আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হত না। একটু অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স যোগ করে বলি, নাটকের শেষে অভিনেতা-'অভিনেত্রী' ও অন্যান্য 'কলাকুশলী'রা এবং গ্রামের লোকেরা রাত বারোটা নাগাদ পুজোবাড়ির দীর্ঘ হ্যাজাক আলোকিত বারান্দায় এক ভোজসভায় পাত পেড়ে বসত। গরম ভাত, মুগডাল, বেগুনভাজা, আলু-ফুলকপির তরকারি আর চর্বিবহুল গরম খাসির মাংসের সদ্ব্যবহার করার জন্যে। তখনকার পুব-বাংলার গ্রামের মানুষ, তারা সে সুখাদ্যের সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করত না।

ওই থিয়েটারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুজোর রোজনামচায় সে বছরের মতো দাঁড়ি টানতে হত। এর পর সেই অবহেলিত ও অপমানিত বইপত্রের কাছে ফেরবার পালা।

Trinayani- *Painting by Agnimitra Saha, Mumbai*

রসমঞ্জরী

সৈকত রক্ষিত

অবশেষে চাষীদের দুশ্চিন্তা দূর হলো। শরাবনের মাঝামাঝিতে নামল বর্ষা।

সময়ের অপচয় না করে এই বর্ষাকে কাজে লাগাতে উঠেপড়ে লাগল গ্রামের মানুষ। তারা এখন তুচ্ছ কারণে সাইকেলে-পায়দলে বাজার-শহরে যাওয়া, ফুলঘরে যাওয়া, কুটুম-বাটুমের ঘরে কুটমালি করতে যাওয়া, তথ্য-অফিসে শিল্পী ভাতা, কন্যাশ্রী ইত্যাদির জন্য ধর্ণা দেওয়া—সব বন্ধ রাখল। তাদের কাছে সবার আগে—হাল-গরু-ক্ষেত। বতর চলে গেলে চাষ মার খাবে। তখন ছ্যেলাপুলা নিয়ে সালভর পেট-দাবড়ি দিয়ে মর। ই-যুগে কেউ কাকৌ দেখার নাই রে বাপ! নিজের ভোগা নিজে সামলাও। মাঠে মাঠে চাষীদের আনন্দের সীমা নেই।

মেঘলা দিন। ফুরফুরে হাওয়া। ঘনেক ঘনেক ঝমঝম করে নামছে বড় ফোঁটার বৃষ্টি আর জৈড়গাছে ঝুনঝুন করে বাজছে কচিপাতা। ঝুমৈর গাইতে গাইতে কেউ ক্ষেত বাইছে। কেউ গরুর পিঠ চাপড়ায় আর কাদা ক্ষেত লাঙল দিয়ে যায়।

হাজারি মাহাতও মাঠে নেমে পড়েছে। ঠেঁটি ধুতি হাঁটুর ওপরে তুলে। বয়স তিনকুড়ি পাঁচ চলছে। গায়ে মাংস নেই, হ্যাড়হ্যাড়ে রগলা শরীর। কিন্তু মনে তেজ আছে। ক-দিন ধরে সে রাগে গসগসাছে। আর মেহনাছে নিজের মনে। ক্ষেতের আলে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হবে, বুঢ়াটা সাটিক হাতে হালের গরু দুটিকে বুঝি অনর্গল খেঁকসাছে, 'হ্যাঁ রে বকাচণ্ডীরা! মালিকের অসুবিস্তাটা টুকুও বুঝতে নাই? পুয়াতি বউয়ের পারা পা ফেললে হবেক? চাঁড়ে চাঁড়ে ক্ষেতটায় ঘুরবি তবে ন?'

আসলে কিন্তু হাল চালাতে চালাতেও সে ব্যাটাকে বাখান দিচ্ছে। গুলজারি তার বড় ব্যাটা। ঝুমৈরা। সে ঝুমুর গান লেখে আর গলায় মাদল ঝুলিয়ে গাঁয়ে-গাঁয়ে আসর করে বুলে। সংসারে মন নাই। এই ভোরখোর চাষের সময়ে ক্ষেপলাচদা কোনদিকে যে পুচকে দিল! ছোট ব্যাটাকে নিয়ে হাজারির কী-করব-কী-নাই অবস্থা। যতই হোক, ছোটটা তো চাষের কাজে এখনও মাহুর হয়নি। সে ইস্কুলে পড়ছে, আট ক্লাসে। চাষবাসের তেমন কিছু জানে না। তাও বাপকে সঙ্গ দিচ্ছে।

তবে গুলজারির ঘর ছেড়ে চলে যাওয়াটা নতুন ঘটনা নয়। আগেও কতবার বাপের সঙ্গে তঞ্চকতা করে কোথাও না কোথাও চলে গেছে। দু-একরাতের জন্য। কিন্তু এবার পাঁচদিন হলো সে ঘরছাড়া। বড় খাসিটাকেও খুলে নিয়ে গেছে ঢের রাতে। রাতে কি কেউ জঙ্গলে ছাগলভেড়ি চরাতে নিয়ে যায়?

ছাগলচোর ব্যাটাকে নিয়ে মাথা গরম হয়ে আছে হাজারির। 'শালার ব্যাট্টা শালা'র ঘরকে আসার নাম নাই। একা হাতে সে কোনদিক সামলাবে? ঘর দেখবে নাকি চাষ দেখবে? তার বারো বিঘার বহাল ক্ষেত। খরায় মার না খেলে বছরে চারশ মণ ধান কোত্থাও যাবে না। পাশের মাহালিদের গ্রাম থেকে কামিন নিয়ে ধান কাটাই চলে দশদিন ধরে। সাত-আটদিন গাড়ি জুড়তে হয় ক্ষেতের ধান খামার তুলতে। পনর দিন ধরে চলে ঝাড়াঝাড়ি আর মরাই বাঁধা। চাল পায় সে দুশো মণ। এই চালটির ভরসায় গোটা বছরের সংসার চলে। এত সোকৈল কাজ তার একার পক্ষে কি করা সম্ভব?

আরেকটা চিন্তাও আছে। গতবারের খড়টা সে এখনো বিকতে পারেনি। গ্রামের লোক এখন বেড়ে সৌখিন। ঘরে ঘরে আজকাল আর কেউ গাইগরু পুষছে না। পুয়ালের চালযুক্ত কাঁচা ঘরও কমে আসছে। তাহলে চাষের খড় কে কিনবে? সে বাংলাগাদা করে রেখেছে। এবার তো বৃষ্টিতে পচবে, গুমা ধরে যাবে। গুমা খড় গরু খায় না। তাছাড়া অঘ্রান মাসে যে নতুন খড়টা উঠবে সেটাই-বা রাখবে কোথায়? কবে থেকে ভাবছে বর্ষাটা নামার আগে পুরুলিয়া গিয়ে শহরের ডেয়ারিওলাদের সঙ্গে খড়ের ব্যাপারে কথা বলে আসবে। পুরুলিয়ায় দু-তিনটা বড় ডেয়ারি আছে।

তাদের সারা বছর খড়ের দরকার। কুইন্টাল পিছু দাম কিছু কম পেলেও সে ছেড়ে দেবে। কিন্তু পুরুলিয়া যাওয়া আর হলো কই? বর্ষা পড়ে গেল।

পাশের ক্ষেতটি থেকে চেঁচিয়ে জানতে চায় কার্তিক সিং। বলে, 'দাদু। ব্যাটা ঘুরল?'

'উ ব্যাটা লয়, পাঁঠা বঠে!'

'অমন ক্যানে বলছ দাদু? দুটা দিন সবুর কর। ঠিকেই ঘুরবেক।'

'ঘুরবেক স্যা ত আমিও বুঝছি। কিন্তুক বিবেচনা নাই? য্যা হ্যাঁ ভালা, আমি ক্যানে এখন ক্ষেতিকাম ছাইড়ে উড়ে উড়ে বুলব? চাষের সময়। এখন তুই বুঢ়া বাপটার হিল্লায় সোব ছাইড়ে দিয়ে যাবিস ক্যানে? আর বড় খাসিটাও নিয়ে গেল। কেমন মনের বিচার?'

'খাসিটাও সঙেই নিয়ে গেছে?'

'নাই ত কী? গেল মাসে পাইকার ঘরকে আইসেছিল। ত ভাবলি এখন বিকব নাই। পরবের সময় ঝালদার হাটে বিকে আসব, দামটাও বেশি পাওয়াবেক।'

'কী আর করবে। ছ্যেলামানুষ বঠে।'

'ছ্যেলামানুষ? দু-বিটির বাপ হঁয়ে এখনো ছ্যেলামানুষ? চাষটাকে হেলা করলে কালদিন বিটি দুটাকে উদ্ধার করতে পারবেক? দুটাকে বিহাদান দিবার ক্ষেমতায় উয়ার কুলাবেক? ঝুমের গাঁহে যেমন কত ধনসম্পত্তি ঘরে আনছে!'

'সে ত সোবেই বুঝছি। মানুষের আপন আপন লাইন থাকে ন? উয়ার ঝুমের লাইনটায় মন বাঁধা পড়ে গেছে।' হাল ঘুরাতে ঘুরাতে বলে কার্তিক।

'ঝুমের নিয়েই থাকুক তাইলে। ঘরকে আসার কী দরকার? ঝুমের নিয়ে থাকুক আর বুঢ়া বাপটা খাইটে মরুক।'

'চুপ দাও, চুপ দাও। মনে শান্তি রাখ।'

'না বল। দুঃখু হয় কি নাই হয়?' হাজারি কার্তিকেব দিকে চেয়ে ফের প্রশ্ন করে বসে, 'আচ্ছা, হ্যাঁরে কাত্তিকা, কুথায় গেছে বল ন?'

'কুথায় গেছে?'

'হুঁ।' হাজারি বলতে গিয়ে বলে না, 'পাছে খাসিটা নিয়ে শালি ভুলাতে শ্বশুরঘরকে চলে গেল?'

কার্তিক মুচমুচ হাসে। সব জানে সে। বলে, 'কুথায় গেছে হামি বলতে লারব। তবে হামার ভাইটা থাকলে বলতে পারত।'

'কে? ফৈটকা?'

'হুঁ। কিন্তুক ফৈটকা ত নাই। সালকা গেছে। মামা ওসুখে পড়ে আছে সেই দেখতে।'

'হামাকে ডাগর ফেরে ফেলে দিল। ও-হো-হো-হো!'

দুই

গুলজারির ঠেক-ঠিকানা ফটিক সিং ভালোই জানে। যত ঝুমেরা-মাদৈলা-বাঁশিয়ালকে সে সঙ করেছে। পুরুলিয়া বাসস্ট্যান্ডে শান্তির হুটেলে তাদের আড্ডা। ফটিক তার ঝুমুরের অনুরাগীও। গাঁয়ে থাকলে দুজনে ক্ষেতের আইড়ে কিংবা তেঁতৈলতলে বসে ঝুমুর নিয়ে বহুত কথা হয়। সে হরদম তাকে উৎসাহিত করে যায়। গুটখা-খৈনির ভাগ দিয়ে বলে, 'মামা, তুমিয়েই হামদের গাঁয়ের বিজলিবাতি। তুমার পারা ঝুমেরা এলাকাটার ভিৎরে আছে?'

গেল বৈশাগ মাসটায় একদিন গুলজারিকে সে বুদ্ধি দিল। বলল, 'মামা, হামার মনটায় বলছে, গাঁয়ে-গাঁয়ে ঝুমেরাদের কাছে তুমার ক-ন বই নাই। যদি থাকত ন, তাইলে দেখে লিতে রামকিষ্ণ-সলাবত-কিত্তিবাস আর অখু কর্মকারের পারা তুমার ঝুমেরও পুরুইলার সোব নাচনিরা ইস্টেজে গাইত। তার হতে হামি কি বলছি টুকু শুনবে?'

'হুঁ, বল। কানটা ত খুলাই আছে।'

'ধিয়ান দিঁয়ে শুনো—তুমি এই বছরেই, ঠিক মনসা পূজার যোগে-যোগে, একটা তাগড়া বই ছাপাও। ঝুমেরের।'

'হামার নামে বই?' প্রস্তাবটা মনে ধরে যায় গুলজারির। চিন্তিত হয়ে মাথা হিলায়। বলে,

'ভালোই বলেছিস ভাইগ্না। বই একটা হামাকে ছাপাতেই হবেক।'

'তুমার ত ঝুমৈরেরও কমতি নাই? একটা বই ত হবেকেই কে-জানে?'

'একটা? পাঁচ-পাঁচটা বই হবেক।' গুলজারি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানায়। 'রঙের ঝুমৈর, বৈঠকী, টাঁইড়শাইলা বহুত রকমের ঝুমৈর হামার আছে।'

বাস্তবিক, ঝুমুর-কবি হওয়ার জন্য লেখায় তার বিরতি নেই। মনে ভাবের উদয় হলে তৎক্ষণাৎ লিখে ফেলে। চব্বিশ ঘন্টা মগ্ন। যেমন সরা ঢাকা ভাতের হাঁড়ি কাঠের আগুনে বলকিছে।

জেলার অন্যান্য ঝুমুরিয়াদের মতো গুলজারিও প্রচলিত সুর ভেবেই পদ রচনা করে। ত্রিপদী ঝুমুরগুলিতে তার ভনিতা সর্বদা একটি বার্তা বহন করে। এই যেমন, 'খটঙ্গার গুলজারি/দেশে করল কেমন আইন জারি ' কিংবা, 'গুলজারি বলে হাঁইসে হাঁইসে/হামার টুঁটি চিপল সংসারের ফাঁইসে' ইত্যাদি।

'তাও আজ তক্ক কত ঝুমৈর ল্যাখা হঁয়েছে?'

'আজ তক্ক? টুকু আগেও দুটা লেখেছি। উগুলা বাদ দিঁয়ে বলছি। এই ধর ক্যানে—' সে মনে মনে ঝুমুরের সংখ্যাটা হিসেব করে। শুধু 'কালার বাঁশি'র উচাটনী ভাবনা নিয়ে কম করে একশ ঝুমুর আছে, 'গাঁথা মালা শুকাঞ যাওয়া'র আক্ষেপ নিয়ে আরো একশ, 'লম্পেটা শাম'-এর পরের বউয়ের সঙে মস্তি করা নিয়ে আরেক শ, 'আসব বলে কই আলি'-মানে বসে-বসে থৈকে যাওয়া নিয়ে আরো একশ, 'আধাদিনে দাগা দিলি' অভিযোগ নিয়ে তিন-চার কুড়ি। তাবাদেও আছে 'নবীন পিরিতি', 'তোর মুহের হাসি ভালবাসি,' 'পুরুইলার মাটি সনার রকম খাঁটি,' 'খরায় হলি আধমরা' এই সব কুড়ায়-কুটুয় আরো শ-তিনেক।

'তাইলে ত বিরাট ভাণ্ডার?'

'শুধু ভাণ্ডার লয়, দশকর্ম ভাণ্ডার। ঝুমৈরের হামার অভাব?'

'তবে চিন্তা কিসের?'

'চিন্তা টাকার।'

'উ-টা মেনেজ হঁয়ে যাবেক। বাঁধে ডুব দিলে গা পুছতে গামছার অভাব? তুমি "হরি হে মাধব/সিনাব ন গা ধুব" এই বলে কাজটা শুরু করে দাও।'

'ঠিক। পুরুইলাকে ত হামি দুদিন ছাড়াই যাছি। ছাপাখানায় খোঁজ লিব। কত-কী খরচ পড়বেক। তাতে যা হবেক হবেক।' পরক্ষণে নিজেই হুংকার দিয়ে ওঠে, 'কী আর হবেক? মুড়টা কাইটে পৈলা হবেক!'

কাজ থাক বা না থাক এমনিতেই তার হপ্তায় হপ্তায় পুরুলিয়া যাওয়া চায়। সাদা পাজামা, ঘিয়া পাঞ্জাবি আর কাঁধে গিঁট মারা ঝোলা। তার ভিতরে তাড়া বাঁধা থাকে শিল্পী হিসেবে তাকে দেওয়া শংসাপত্র। দশে-মাসে যখনি সে সরকারি-বেসরকারি অনুষ্ঠান করে, তখন পারিশ্রমিকের থেকে শংসাপত্রটি নেওয়ার ব্যাপারে তার তদ্বির বেশি। সরকারি বাবুটিকে আগে থেকে বলে রাখে শংসাপত্রে তার নামের আগে যেন 'কবি' শব্দটি লিখতে ভুল না হয়। কবি গুলজারি মাহাত, সাকিম খটঙ্গা, থানা-জয়পুর।

বই করার ঘুরঘুইরা পকা-টা মাথায় ঢুকে যাওয়ায় তার মনে হচ্ছে, কবি গুলজারি মাহাত-র নামে যতদিন না বই হচ্ছে ততদিন না স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছে তার গুরুত্ব থাকছে, না অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছেও তার সম্মানের জায়গাটি পোক্ত হচ্ছে। নিজের নামে বই থাকা কি কম কথা? ঝোলা থেকে বের করে সাহেবের টেবিলে টঙ করে রাখলে সে যে কবি তা মুখে বলার প্রয়োজন হবে না। বই মানেই হলো কবিসত্তার প্রমাণ এবং স্বীকৃতিও। প্রোগ্রাম পেতে সুবিধে হবে। বাড়তি খাতিরও পাবে। কোথাও কোথা চা-বিস্কুট। কাপের সঙ্গে প্লেটও।

তিন

গুলজারির পুরুলিয়া যাওয়াটা আরো বেড়ে গেল। কোটশীলা-পুরুলিয়া বাসে দশটা-এগারোটাকে

উঠে পড়ে। পুরা ভাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। কণ্ডাকটারের হাতে কয়েন গুঁজে দেয়। তারপর বাসের মধ্যে কতজনের সঙ্গে কত যে রঙ্গ-তামাশা। সব আলোচনাতে ঘুরেফিরে আসে ঝুমুর আর ডাঁইড় নাচ।

ভালো কথা, সে ডাঁইড় নাচেরও দল করার মতলবে আছে। সেই প্রোজেক্ট মাথায় নিয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে বিটিছ্যেলাদের জড়ো করছে। দশ-বারোটা মেয়েকে নাচের প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করবে। মেয়েদেরকে দলে পাওয়া এখন ততোটা সহজ না হলেও বই বেরবার পর আর সমস্যা হবে না। অভিভাবকরা ভরসা পাবে, মেয়েদেরকে অনুষ্ঠান করতে ছাড়বেও। তাতে দলটি সাজলন্ত হবে, মনিহারী দোকানের পারা চমচম করবে।

জেলা তথ্য অফিসে গিয়ে দলের নাম নথিভুক্ত করাবে গুলজারি। 'খটঙ্গা গ্রাম মহিলা ডাঁইড়নাচ পার্টি।' নৃত্যগুরু—কবি গুলজারি মাহাত। মাসে মাসে যাতে প্রোগ্রাম পায় তার জন্য ঘোষবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। তথ্য অফিসের ঘোষবাবু লোকশিল্পীদের কাছে 'ঘুষবাবু' নামে অধিক পরিচিত। গুলজারিও ঘুষবাবুর হাতে দু-পাঁচশ গুঁজে দেবে। নগদ যদি জোটাতে না পারে, বাঁধে খিয়া জাল ফেলে ওপিসারের ঘরে সকাল সকাল মাছ পৌঁছে দেবে। বলবে, 'ল্যান সার, খাঁইয়ে দেখুন। হাইবিট লয়, আর ই-মাছ তেলেঙ্গা ভাষাও বলতে লারে। ঘরের মাছ বঠে—ভাজতে ভাজতেই স্যান্ট পাবেন। দমে সুয়াদ!'

তারপর থেকে শুরু হয়ে যাবে ব্লকে ব্লকে সরকারি অনুষ্ঠান করতে যাওয়া। পণপ্রথা, কন্যাশ্রী, ভোট-পরব হাবিজাবি নিয়ে ঝুমের লেখা। বায়না আসবে নৈঋক-ঈশান কোণ থেকেও। বান্দোয়ান-বরাবাজার-ইলু-জারগো সবদিক থেকে—যেভাবে দল-সাফাই করা ঘাটে চার ফেলতেই তুড়-বানতুড়-কালবাগুশ মাছ ছুটে আসে।

এতকিছু পরিকল্পনা করে এবং তার সুবর্ণ সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে উত্তেজিত গুলজারি। দল গড়ার আগেই যদা-মধার পাঞ্জা ধরে বলে বেড়াচ্ছে দলের সাতকাহন।

'জোহার!' সম্বোধনসূচক শব্দ উচ্চারণ করে, কোনো কুশলবার্তায় না গিয়ে বলে, 'এতদিন ভলানাথের পার্টির লাচ তরহা দেখলে ন? দেখলে কি নাই দেখলে? কখনো ভেলাইগড়ায়, কখনো লাগারডি, কখনো শালডিহা-গোবিনপুরে। ইবার তরহারাকে গুলজারি মাহাতর ডাঁইড় পার্টিটা বারেক দেখাব। দেখলে তরহা বুঝবে—হাবড়া বিরিজ কৎনা অসার! ধূলা উড়াঞ দিব!!! গটা জ্যালার ভিৎরে ফাস্ট প্যারাইজটা যদি না লুটে আনতে পারি, ত গুলজারি মাহাতর নামে তরহা ছুটু কুকুরছানা পুষবে! কাবরা দেখে।'

'ভুলেও অমন কাজ কৌ করতে যাই-অ না। কুকুরে কামড়ালে বেজ হবেক।' সরস মন্তব্য করে কেউ।

'তলানাথের সঙে তুলনা?' তার ফুটানির কথা শুনে পেছুদিক থেকে কে যেন চোঙা ফুঁকে দেয়। আবার কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে, 'তুঁই যে রাম না হতেই রামায়ণ গাইছিস রে বাপ!'

'রাম ত হামি। সীতাগুলানের খোঁজ চলছে এখন। তার হতে দুদিন বাদে বাদে পুরুইলাকে আসছি আর জিলিং, বিষকুদরা, হাতিমুড়ি, বরাবাজার লাইনে যাছি—লেপ-রাইট করছি।' বলতে-বলতে সে পুরলিয়া বাসস্ট্যান্ডে শান্তির হোটেলে জড়ো হওয়া রসিকজনদের তার সদ্য লেখা ঝুমুরটি শোনাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কাঁধে ঝুলছে গিঁট বাঁধা ঝোলা। হস করে হাত ঢুকিয়ে থলিভর্তি শংসাপত্রের ভিতর থেকে তৈলাক্ত খাতাটি বের করে।

'শুনো তবে কাখে বলে ঝুমৈর।' ঝাপসা চশমা কপালের দিকে ঠেলে গুলজারি গাইতে থাকে—

বরিষণ রাতিয়া-আ-আ-আ

দড়ির ছিঁড়া খাটিয়া-আ-আ-আ

মনে পড়ে

হামার পহেলি পিরিতিয়া মনে পড়ে

ওহোহোহো মনে পড়ে! ভাইরে মনে পড়ে!

হামার পহেলি পিরিতিয়া মনে পড়ে…

শ্রোতারাও তেমনি রেঙহার দল। মুখে পান, হাতে চুন। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে মেতে ওঠে। ভাদরিয়া চালের এই ঝুমুরটির তালে বগল বাজানোর মতো করে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে: 'মনে পড়ে! ভাইরে মনে পড়ে…'

আশপাশ থেকে লোক জড়ো হয়। হোটেলওলা-পানগুমটিওলা বিরক্ত হয়ে বলে, 'এ ভাই, গুলজারি! তরা যা ন! যা! মাথা খারাপ করিন্ না। দকানদানিটা করতে দে!'

'আ-আ-আই দেখ। লোক যদি হামার ঝুমৈর শুনতে ছাতা বগলদাবা করে দৈঁড়ে আসে ত স্যাটা হামার দোষ? তাও ওই একদাগ। এক দাগেই কাফি। এখন ইয়ারা যদি বলে, গুলজারি ভাই, আরেক কলি হোক, ত হামি বলব, নাই নাই এক দাগেই কাফি। আর এই দকানি শান্তিভাইও যদি বলে, আরেকটা ডাঁইড়শাইলা হোক, ত তাকেও হামি বলব—আর হবেক নাই। মুড় পটকিলেও হবেক নাই। ইবার সেই সবলা মেলায় হামার পোগরাম আছে তরহা শুনতে যাবে। এখন হামি চললি ছাপাখানায়। বহুত কাজ! বই ছাপা চলছে!'

চার

পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার আগে কয়েকদিন সে পুরুলিয়ায় এসে এসে প্রেসে ঘনদড়ি দিয়েছে। 'ঘনদড়ি'-র অর্থ, 'কাজ আদায় করতে ঘন ঘন আসা।' শ্রীরাধা প্রিন্টার্স, দুলালবাবুর ছাপাখানায়। বই কেমন হবে, কত পাতার, কাগজ কেমন—এসব সে প্রেস মালিককে জানিয়েছে। বইয়ের নামও ঠিক করে ফেলেছে—'মানভূম ঝুমুর রসমঞ্জরী।' কবি গুলজারি মাহাত। সাকিম খটঙ্গা, থানা-জয়পুর। এমনকি, সে বলেছে প্রচ্ছদে তার যেন একটা বড় ছবি থাকে। কবি যেখানে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, কাঁধে ঝোলা নিয়ে, গগলস পরে থাকবে। মাথায় থাকবে লাল গামছার পাগ এবং গলায় ঝুলবে মাদল। এইসব দিয়ে বইটি সাজিয়েগুছিয়ে ছাপলে তার খরচ কত পড়বে?

'খরচ?' দুলালবাবু পাল্টা প্রশ্ন করেছিল। 'কত কপি ছাপবি?'

'কপি?' গুলজারি অবাক হয়ে মালিকের কথা সংশোধন করে বলেছিল, 'কপি ক্যানে ছাপব আইজ্ঞা? বই ছাপব, বই। খাতা লয়, ঝুমৈরের বই।'

'সে ত বুঝছি। ত, বই কতগুলা ছাপবি? পঞ্চাশ, একশ, দুশ—কত?'

এক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ হয়ে থাকে গুলজারি। গগলসটা পরে গম্ভীর হয়ে বলে, 'দশ হজাজার।'

'দশ হাজার?' প্রেস মালিকের মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম। 'সরকারি বই বঠে নকি? দশ হাজার ছাইপে তুঁই কী করবি রে ভাই?'

'কী করব মানে? পুরুইলা জ্যালায় চোদ্দটা ব্লক আছে, পঞ্চাশটা নামকরা হাট আছে। মানবাজারে সিজন মেলা আছে, পুরুইলায় টুসু মেলা আছে। বিকে বিকে ফুরাব। একটা বইও হামি ফিরি-ফান্ডে কাকৌ দিব নাই। একহাতে পড়ে শুনাব, আরেক হাতে টাকা লিব, আরেক হাতে বই দিব।'

'তিনটা হাত?'

'তিনটা হাত কই হৈল? ভাল করে যোগটা করবেন তবে ন। একহাতে বই খুলে ঝুমৈরের একটা নিমুনা পড়ে শুনাব। হৈল, একটা হাত? ইবার আরেক হাতে পৈসা লিব আর ওই হাতেই বইটা থলির ল্যা বার করে দিব। তাইলে দুটা হাতেই ত হৈল?'

'হুঁ, দুটাই হৈল।'

'তবে? হামি অমন দুইকে তিন করার লোকেই লই। বে-ঐন্যায় বলবই নাই। কিসকে বলব?'

'কিন্তু দশ হাজার ত বহুত বই?'

'কিছুই বহুত লয়। শুনতেই বহুত। থলিয়ে বই আর গলায় মাদৈল। তাবাদে দেখে লিবে! হামি দশ দিনের ভিৎরে গটা পুরুইলা জ্যালার হরেক হাটে মানুষকে ঝুমুর শুনাব আর বই বিকতে

থাকব। চিন্তার ক-ন কারণ নাই। ট্যানস্যান লিবার নাই, দিবার আছে।'

'দশ হাজার বই ছাপার খরচটা জানিস? দেড় লাখ।'

'দেড় লাখ! তাইলে ত বহাল ক্ষেতটা বিকতে হবেক? হামি ভাবলি—'

'শুন, গুলজারি। তোকে ভাবতে হবেক নাই। আমি যেটা বলছি তুই সেটা কর। এখন তিনশ বই ছাপা। ওইগুলা আগে বিকে ফুরা। ফুরালে আরো ছাপবি। তখন শুধু কাগজ, বাঁধাই আর ছাপার খরচ দিলেই হবেক।'

'ঠিকেই বলেছ। যেমন-যেমন ফুরাবেক তেমন তেমন ছাপাব।'

'হুঁ, তাইলে টাকাটাও তোকে একসঙ্গে দিতে হবেক নাই। আগে তিনশ বই ছাপানির দাম দিবি। ঠিক আছে?'

'ঠিক। তিনশ বইয়ে কত খরচ? কম্পুটারটা খুলে বলুন ন। টাওয়ার আছে?'

'টাওয়ার?' দুলালবাবু খাতা-কলমে নিঁখুত হিসেব কষে বলে, 'সব নিয়ে সাড়ে পাঁচ হাজার।'

'মোটেই?' নিশ্চিন্ত হয়ে সে বলে, 'তাইলে কমেই বঠে। চালু করে দেন, চালু করে দেন। তাবাদে হামি দেখছি।'

'দেখছি বললে হবেক নাই। আগে হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে যাবি তবে কাজ ধরব। অগ্রিম না দিলে মুখের কথায় হবেক নাই।'

'ক্যানে দিব নাই। কাল বাদ পরশু তথ্য ওপিসে আসছি। তখনি দিয়ে যাব।'

'আর হুঁ, বইয়ে ভূমিকা থাকবেক?'

'ভূমিকা? উটা কী জিনিস? জমি-ভূমি বাপে দেখছি। হামি নাই জানি।'

'ভূমি লয়, ভূমিকা। মানে তোর এই বইটা করার ব্যাপারে কে তোকে উৎসাহ বা পরামর্শ দিচ্ছে, কে তোকে নানাভাবে সাহায্য করছে আর সেই সঙ্গে এই বই নিয়ে তোর দুঃখ-কষ্ট-আনন্দ সব তুঁই অল্প কথায় লেখতে পারিস।'

'উটারও পৈসা দিতে হবেক, ন ঐয়ার ভিৎরেই হবেক?'

'না, ওই টাকাতেই হবে। ভূমিকার জন্যে বাড়তি দিতে হবে না।'

'ওঃ, তাইলে চিন্তা নাই। উটাও পরশুই দিয়ে যাব। কিন্তুক ৩০০ বই আমাকে মনসা পূজার একহপ্তা আগেই দিতে হবেক। ক্যানে বলছি বলুন ন?'

'কেন?'

'তখন বাজারটা গরম থাকবেক। গাঁয়ের হাটে হাটে হাঁস-পাঁঠার সঙে হামার 'রসমঞ্জরী'টাও বিকাবেক ভাল। পুরুইলার এই ঝুমের এমন জিনিস য্যা ডাত্তরবাবু কী করবেক ঝুমেরেই আপনি লাড়ি ধরতে পারবেন। হাটে ঢুকে হামার নাম হাঁকায় মাদৈলটা যেই চাপড়াঞ দিব ন—ওঃ! ভিড়ভিড় করে লোক বগলে হাঁস আর হাঁতে পাঁঠার পাঘা ধরে ঘেরে ধরবেক হামাকে। তার হতেই মনসাপূজায় হাঁস বলি নিয়েও একগণ্ডা ঝুমের ঢুকাঞ দিঁয়েছি! লেব্বাছাকে! বই কিনবি নাই মানে? কিনতেই হবেক। এক বইয়ের ভিৎরে হরেক মশলা আছে। তার হতেই বলছি, মনসা পূজার আগুই দিতে হবেক। না দিলেই চিড়ার বাইশ ফের!'

'দিব, দিব।'

সেদিন বেলা তিনটার 'জয়কালী' ধরে গ্রামে ফিরে আসে গুলজারি। খুব চিন্তিত মন নিয়ে। গাঁয়ে ঢুকেও কারো সঙ্গে রা কাড়ল না, মুখামুখি হলেও 'জোহার' জানাল না। ঘরে যে ঢুকল—কপাট ঠেলার হড়র-ঘচর আওয়াও হলো ন। সুটু-সা-আ-আ-টু ঢুকে গেল।

চুলহাশালে বসে বউ ধামা-কুলা নিয়ে ঘোমটা মাথায় খই পাছুড়তে ছিল। জাঙের কাপড় সরানো। ছাগলছানাটা ঘুরছে খেয়াল করেনি। গুলজারি ঢুকতেই সে কুলা রেখে ঘটিতে পা

ধোওয়ার জল এনে দেয়। মুখ মোছার জন্য কাঁধে গামছা ফেলে দেয়। আর টিনের থালায় কলাই সিঝা, মুড়ি, পিঁয়াজ-লঙ্কা খাটে নামিয়ে রাখে। খুরার পাশে নামিয়ে রাখে চকচকে মাজা লণ্ঠন। তারপর 'হাইট হাইট' করতে করতে ছাগল খেদতে ছুটে যায়। গুলজারি নীরব।

পা ধুয়ে, মুখে জল নিয়ে, দড়ির ছিঁড়া খাটে বসে আপন মনে মুড়ি চিবাতে থাকে সে। শহর থেকে ফিরে আসার পর তাকে খুবই চিন্তিত দেখায়। সেই চিন্তার রেশ রাতেও কাটল না।

ঘুমাবার সময় ঘরে হুড়কা দিয়ে, বউ তার পাশে এসে বসে। বলে, 'তুমার কী হঁয়েছে বল ন। রা-য়েই কাড়ছো নাই যে? পাছে ভিৎরি ক-ন ওসুখ-বিসুখ হঁয়েছে?'

'বাপের কলা হঁয়েছে!' এক খেঁকসানি দিয়ে বউকে তক্তার হাও মুড়ায় পাঠিয়ে দেয়। 'স্লা, মাথায় এৎবড় চিন্তা ঢুকে আছে। ডিমাগ কাজ করছে নাই। যখনি সুলঝাবার লাইগে ঘুন্নিয়ে বসছি, তখনি খেঁচরাতে আসছে। সুগুম থাক!'

আবার সে ভাবনার অতলে ডুবে যায়। চিন্তা করতে থাকে ছাপাখানার অৎনা টাকা কীভাবে ব্যবস্থা করবে। অগ্রিমটা তার আছে, এক হাজার। কিন্তু বাকি টাকা? কিছু একটা কাণ্ড সে ঘটাবে এমন পরিকল্পনা তার মাথায় অনেক দিন ধরে খেলছে।

রাত করে হঠাৎ বারান্দায় বাঁধা খাসিটা ম্যাঁ-ম্যাঁ ডাক দিতে থাকে। তড়াক করে ওঠে গুলজারি। দম কমিয়ে রাখা লণ্ঠনটি হাতে নিয়ে তার আলোটিকে তেজ করে সে আগল খুলে বেরিয়ে আসে। খাসির সামনে লণ্ঠনটি ধরে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে দেখতে থাকে। যেন এতদিন সে মানুষ দেখেছে—ছাগল দেখেনি। সে দেখছে আর মনে মনে কুৎ করার চেষ্টা করছে। একসময় নিশ্চিত হয়। নিজেকেই সে প্রতিপক্ষ ভেবে মনে মনে বলে, 'না-আ-রে ভাই! যেটা বলছি স্যাটা শুন ন। হামার মনটায় বলছে, আধমণ। তার কমও লয়, তার বেশিও লয়। হারাবাজি হোক!'

আধমণ। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে গুলজারি। চিন্তার কিছু নেই। বহু দিনের পুরানো বিরাট তক্তপোষটিতে ওই দূরে কুঁকড়ে শুয়ে রয়েছে ভাদি-বিন্তির মা। সে ফুর্তিতে তালগুড়গুড়ির পারা গড়িয়ে আধো ঘুমে থাকা বউয়ের কাছে চলে যায়। থুতনিতে আদর করে বলে, 'কই শুনলি! এগৌ, ভাদি-বিনতির মাঈ। ঘুর ইধারে টুকু, ঘুর। তখন হামার মাথাটা গ্রম হয়ে—'

ভাদি-বিন্তির মা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

রাতে স্বপ্ন দেখল গুলজারি মাহাত। আহা, কি সুন্দর সে-স্বপ্ন। ভাগ্যের জোর না থাকলে মানুষ এমন জিনিস ঘুমের ঘোরে দেখে না। সে দেখছে আর আনন্দে ঢেউ তুলে হাসছে! খ্যাঁচ-খ্যাঁচ শব্দ করে নড়ে উঠছে তক্তাপোষটি।

পরিকল্পনা সে আগে থাকতে ছকে রেখেছিল। প্রেস থেকে বান্ডিল পাওয়া মাত্র হাটে হাটে ছুটবে। ভিড়-গাদালে ঢুকবে। পিছনে-পিছনে বইয়ের বোঝা মাথায় নিয়ে ফটিক ভাইগ্না, তার পিছনে বাঁশিয়াল। নিতুড়িয়া, রঘুনাথপুর, কাশীপুর থেকে শুরু করে ঝালদা, জয়পুর, বরাবাজার, বান্দোয়ান, বলরামপুর, আড়ষা, বাগমুণ্ডি প্রতিটি ব্লকে যাবে আর তলের মাটি উপর করে আসবে। মাদল বাজিয়ে, রঙীন-রঙীন ঝুমুর গেয়ে। সঙ্গে একটা বাঁশিয়াল—বিমল কুম্ভকারকে বলেও রেখেছে, 'দেখ ভাই, হামার পঁন্দে পঁন্দে তকে ঘুরতে হবেক। হাটে হাটে বাজাতে হবেক। সকাল-বিকাল দকানে চা-নাস্তা করব, হুটেলে ঝাল-ভাত মারব। রাতে চিনহা-জানা কারো ঘরে উল্টে দিব। দৈনিক পঞ্চাশ টাকার বেশি এক লাল পওসা দিতে লারব।'

রাজি হয়েছে বিমল। ঝুমুরে মাতিয়ে দেবে গুলজারি; রাঢ়বঙ্গের গরিব-দুখি মানুষকে। তারা থলিতে, বগলে হাঁস নিয়ে তার ঝুমুর শুনতে মণ্ডলাকারে দাঁড়িয়ে পড়বে। হাঁসগুলি ছ্যারেক-ছারাক কোলে গরম বিষ্ঠা ছাড়বে ওরা ভ্রুক্ষেপ করবে না। ঝুমুরই তো তাদের প্রাণ, তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র প্রেরণা।

প্রথমেই সে পুরুলিয়া শহরে কাজ করার কথা চিন্তা করল। পুরুলিয়া জেলা শহর। এখানে সকাল থেকে হাজার হাজার মানুষ ঢুকছে চতুর্দিক থেকে। বরাকর রোড, রাঁচি রোড, টাটা রোড, বাঁকুড়া রোড, আর মানবাজার রোড ভায়া কাঁসাই নদী। এই মানুষগুলি কোর্ট-কাছারি-বাজার আর অফিসের কাজে বাসস্ট্যান্ডে নামছে। বাসস্ট্যান্ড ঘিরেই যত গ্রামবাসীদের আমদানি। তাই বড়হাটে যাওয়ার আগে বাসস্ট্যান্ডে ঢুকল সে। সঙ্গে আছে ফটিক ভাইগ্না। মাথায় বইয়ের বান্ডিল। শান্তির হুটেলে এককাপ করে পাউডার দুধের পুরো-পুরো চা আর একটা করে গরম ভাবরা খেয়ে সঙে-সঙেই উঠে পড়ল। আজ আর আড্ডবাজির ফুরসৎ নাই। জয়পুর-মানবাজারের বাসগুলি ঢুকতেই মাথায় পাগ বাঁধল গুলজারি, কালো চশমার কাঁচ মুছল, তারপরই মাদলে চাপড়! বাঁশি-মাদল বাজতে না বাজতেই, বিরুলের পারা গ্রামবাসীরা বাস থেকে নেমে ছুটে আসতে লাগল। বই কেনার জন্য তাদের মধ্যে ধাকলা-ধাকলি লেগে যায়। একাহাতে বই বিকে পেরে উঠছে না ফটিক ভাইগ্না। বাঁশিয়াল সুর তুলে দিয়েছে। নাচছে ভিড়ের সবাই। ঝুমুর ধরেছে গুলজারি মাহাত। ভনিতা শুনে বাহবা ধ্বনি উঠছে চারোদিকে—

গুলজারির এই মিনতি রাখ মা ঝুমেরে মতি

দেশের চৌকিদারে করছে চুরি কেমন তাইলে চৌকিদারি

রসিকজন পড়ে দেখ কী বলছে কবি গুলজারি…

বাহবা রব ওঠে চতুর্দিকে! জোরে জোরে চাঁটি পড়তে থাকে মাদলে। কাঁপতে থাকে খাট। ঘুম ভেঙে যায় ভাদি-বিন্তির মায়ের। সে পাশ ফেরে। গুলজারির কাঁধের ওপরে মাথা তুলে নেহুড়ে তাকে লক্ষ করে। তখনও সে কৈষে হাসছে। ভাদি-বিন্তির মা অবাক। কী হলো কি মানুষটার! কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে কান্নার সুরে বলতে থাকে, 'হ্যাঁ গো, ই কী হৈল তুমার? পাছে ডাইনে খাইল নকি? কই শুনলে!'

'য়েঃ, আর মোটেই পাঁচটা বিকতে বাকি ছিল—একেই দিনে তিনশ বই খতম—আর এমনি সময়ে দিলি ডাইকে। ইবার এই পাঁচটা বই কাখে বিকব? তুঁয়েই তাইলে কিনে লে।'

'কী কিনতে বলছিস গো?'

'ঝুমেরের বই। রসমঞ্জরী।'

'হামি ত ল্যাখাপঢ়াই জানি নাই।'

দিনের দিন প্রেসে এসে হাজির গুলজারি। গায়ে সেই রঙ জ্বলা ঘিয়া পাঞ্জাবি, আকাচা সাদা পাজামা, গিঁটওলা ঝোলা, মাথায় গামছার পাগ আর চোখে পিচের মতো কালো রোদ-চশমা। চশমায় ঢাকা পড়ে গেছে রাতজাগা লাল চোখ, পিঁচুটি পড়া। সঙ্গে এনেছে এই পোশাকে 'দি ফটো হাউস'-এ সদ্য তোলা দু-কপি 'ফোটু', তাড়া বাঁধা পাণ্ডুলিপি, ভূমিকাসহ। ভূমিকাটি কবি জোরদার লিখেছে। মনের যত আবেগ দিয়ে, গভীর মনোকষ্টে চোখের জল মুছতে মুছতে সে লিখছে:

'ভাইসব! আজ হামার জীবনে জয়ের দিন। বহুত দিন ল্যা হামি বগলে মুর্গা নিয়ে বডটাঁইড়ের হাটে লড়হাইয়ে গেছি। কিন্তুক ক-ন দিন মুর্গা জিততে পারি নাই—শুধু হাইরেছি আর হাইরেছি। তলমুখ করে ঘর ঢুকেছি। কিন্তুক এই পর্থম হামার গাঁয়ের লোককে দেখাব হামার মদ্দানি—হামিও পারি!

হামি ভুলি নাই, কারা কারা হামাকে চঙা ফুঁকে ঠাট্টা করেছে, কারা হামার পাঞ্জাবির পেছুদিকে দড়ি বাঁইন্ধে কুকুরের গলায় পরাঞ দিঁয়েছে! আমি ভুলি নাই। রাইত জাইগে জাইগে লেখা এই বই হামি তাদেরকেই উৎসর্গ কল্লম—নিবেদন কল্লম তাদের চরণকমলে। আর চৈখের জল নিবেদন কল্লম বাগদেবীকে, এই আশায় যে, মাগো, হামি যদি 'ইন্ডা'র নামকরা ঝুমেরা নাও হতে পারি, ক-ন দুঃখু নাই। কিন্তুক একদিনকে যেমন কবি গুলজারি মাহাত-র এই 'ঝুমুর রসমঞ্জরী' বইটি হামার প্রণম্য ঝুমুরকবি ভবপ্রীতানন্দ ওঝার 'ঝুমুর গীত মঞ্জরী'র গায়ে ঠেসাঠেসি হঁয়ে বই-দকানে শো-কেশের ভিৎরে

থাকে। ব্যাস, আর কুছু চাই নাই।–হামার মাটির ঘরে বাঁশের খুঁটি মা/পাই যেন তায় খড় জোগাতে...

আর সবশেষে বলি এই বইয়ের লাইগে যে আমাকে রাতদিন উসকানি দিয়েছে সেই ফটিক ভাইগ্গাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। এমন মহৎ কাজে তার ষড়যন্ত্র না পালে আমি অকূল পাথারে ঝাঁপ দিতেই লারতি। উয়েই হামার অকূলতারণ। ভাইগ্গা যদি খুঁকড়া ডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠে, সুবন্নরেখা লদী পার হয়ে মুরির হাটে আমার সঙে পাঘায় বাঁধা আধমণি ঘাসিটা নিয়ে না যা'ত, তাইলে এই বই ক-ন মতেই হত না। ভাল থাকো ভাইগ্গা। রিঝে-রঙে থাকো। তুমাকে আশীব্বাদ করি—১-লাগার গেতু জাল ছাইড়ে তুমি যেমন ৪-লাগার বাটাই জাল বাঁধে আড়তে পারো।

জয় জওয়ান জয় কিষাণ। পুরুইলার ঝুমের জিন্দাবাইদ। রাঢ়বাংলা জিন্দাবাইদ।

–কবি গুলজারি মাহাত। সাকিম খটঙ্গা। থানা-জয়পুর।'

এই যুগান্তকারী ভূমিকা আর সেই সঙ্গে হাজার টাকা বারে বারে থুতু দিয়ে গুনে ছাপাখানার মালিকের হাতে দিয়ে গুলজারি হাতজোড় করে আবার বলেছে, 'মনসা পূজার আগে বই দিতেই হবেক আইজ্ঞা। মনে রাখবেন, যেদিনেই মুরির দ্বিতীয় হাটটা লাগছে, হামি সেই দিনেই আপনার কাছকে আসছি। মাল ছাঁদাবাঁধা করে রাখবেন।'

পাঁচ

বাপ কত করে বুঝায়, 'তুঁই ঝুমের লেখছিস লেখ, আসর করছিস কর। তোকে কে বারুন করেছে? কিন্তুক লিজের ক্ষেতিবাড়ি দেখবিস নাই? সংসারাটা 'জহন্নামে' পাঠাছিস!'

যতই বলুক ক্যানে, গুলজারি থোড়াই শুনবে? কথায় আছে—'যত কিলাবি কিলা/পিঠ করেছি শীলা।'

উল্টে, বাপের সঙ্গে ঝুনাঝুটি লেগে যায়, ডাং বার করে, থাল-বাসন-জলের গিলাস হিররর্-হিররর্ গহালঘরে ফাবড়ায়। আর ঘরগুষ্টি সবাইকে, এমনকি তার আধাবয়সী নিরীহ-সরল বহুটাকে পর্যন্ত যিসতিস বলে। ধমকায়। তখন মাথার পাগ খুলে পড়ে। কাঁধ তক্ক ঝাঁকড়া চুল আউল-ঝাউল হয়ে যায়। উত্তেজনায় গুর-গুর করতে করতে মনস্তাপ করে, 'শালা! শালা! গটা দুনিয়াটা হামার দুশমন হঁয়ে গেছে। হামাকে ক-ন মতেই কবি হতে দিবেক নাই। দিবেকেই নাই। যত মুখ্যুর ডাং-এর ঘরে জন্মেছি হামি। কবি-লেখার মর্ম ইয়ারা বুঝবেক? তিল পিষলে তেল হয়, ব্যাঙ ধরলে পুড়াঞ খাইতে হয়—এৎনাটুকুই জানে। জীবনে খাওয়া-মাখা-পৈসার কী দাম? কীর্তির দাম। জানিস, ভবপিতার পারা অৎবড় কবি দেওঘরে পণ্ডাগিরি করেছে?'

'সে ত পুরোহিত। পণ্ডাগিরি করাই তার কাজ ছিল। নিজের কর্তব্য পালন করেছে আর দশ-বিশ পণ ঝুমুরও লিখেছে। যত গুহক চণ্ডালদের নিয়ে তুঁই কী রাজ্যজয় করলি? না কোবৌ কফি-বাড়িয়ে পানি ঝিঁটলি, না চাপান দিলি, না ঝুমুর গাঁইহে দু-পাঁচশ ঘরকে আনতে পারলি। খুঁখড়া লড়হালেও মানুষ কোবো-কেমনো জিতে। তোর ওই একথলি কাগজ নিয়ে পুরুইলা ঘুরাই সার।'

বাপকে কিছু বলতে না পেরে সে দাঁত কিচকিচায়। জলের ঘটি পায়ে উল্টে দিয়ে বলে, 'যাঃ, শ্লা এই সংসারে আর থাকব নাই! ফুলঘরকেই চলে যাব। ফুলবাবাই হামার ভাল!'

জলের ঝাপটা খেয়ে নিভে যায় লম্পোটি। ভাদি-বিন্তির মা গুহালঘর থেকে লন্ঠন আনতে যায়। অন্ধকারে গুলজারির বুড়ি মা ব্যাটার হাত ধরে, 'না ব্যাটা, যাস না। পাঁদ্দিন বাদে আসছে গুরুবারেই মনসা পূজা। গাঁয়ে জাঁতমঙ্গল হবেক। এমন পরবের সময় ঘরের ল্যা লিয়াই-ঝগড়া করে বেরাতে নাই।'

'ছাড় হামাকে। কারো কথা মানব নাই। হামি কাল ভোরেই খটংগার ল্যা বরাবাজারকে যাছি। গুরুর দিব্যি!'

'অমন না কর ব্যাট্। গলায় কাপড় লিছি। লেহোর করছি। তুঁই ই-সময়ে চলে গেলে কে

ক্ষেত বাইতে যাবেক? তোর বাপ বুঢ়া মানুইষ। একা লারবেক।'

'বাপেই ক্ষেতকে যাক। হামি নাই হালগরু নিয়ে যাব। তরা ইবার বুঝে কর। হামি সকালেই পালাছি।'

শেষতক কারো মানা শুনল না গুলজারি। তবে সকালে না, সে রাত তিনটাকে ঘুম থেকে উঠল। টুঁ-শব্দটিও করল না। ভাদি-বিন্তির মা তখন শায়ার বাঁধন আলগা রেখে ঘুমাছে। অন্ধকারে আস্তে করে কপাট খুলল গুলজারি। লুঙ্গি-গামছাসহ কাঁধের থলিটা নিল। তারপর বারান্দায় কাঠের গোঁজে বাঁধা খাসিটার পাঘা খুলে কব্জিতে জড়িয়ে নিয়ে—চলতেই শুরু।

কুলহি মুড়ায় কারিক্যান্দ গাছটির তলে দাঁড়িয়েছিল ফটিক ভাইগ্না। বাতাসে আকন তুলার পারা মিহি মিহি বৃষ্টির রেণু।

রাতে-রাতে ওরা খাসি নিয়ে চলল। কোটশীলা-মুরগুমা হয়ে একেবারে অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায়। পাহাড়ে এখন পর্যটকদের ভিড়। ওখানের হাটে কিংবা বড় কোনো হোটেলে বিক্রি করলেও সে ভালো দাম পাবে খাসির। খালি একটাই ভয়, অন্ধকারে ঠাকুরে যেন ওদেরকে পথে না টেকায়। ঠাকুর মানে পাহাড়ের হাতি।

মুরগুমা পৌঁছতেই অন্ধকার পুরোপুরি কেটে গেল। টিয়াঠুঁটি আমের মতো ভোরের আলো মুখে পড়তেই পাহাড়ে উঠতে লাগল ওরা।

সাত

গুলজারির ফুলঘর বরাবাজারে। সে যখন এক-দেড় বছরের, তখন বাপমায়ের সঙ্গে ইঁদপরব দেখতে বরাবাজার গিয়েছিল। ভাদ্র মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে জেলার এই প্রাচীন পরবটি হয়ে থাকে। বহু গ্রামবাসী এই পরব দেখতে আসে। আঞ্চলিক গানেও তার উল্লেখ রয়েছে—

বরাবাজারের ইঁদ পরব
চাকলতোড়ের ছাতা রে

ছাতা দেখতে লক যাছে খাতা খাতা রে...

'খাতা খাতা' মানে দলে দলে। স্থানীয় রাজা বা ভূস্বামীরা এই পরবের আয়োজন করে থাকে। বর্তমানে রাজার উত্তরসূরির হাতে বৃহৎ একটি ছাতাকে কেন্দ্র করে পরবটি উদযাপিত হয়। আদিতে, পরবের কয়েকদিন আগে রাজা সপারিষদ শিকারে যেতেন। সেসময় তিনি একটি বলশালী শাল বৃক্ষ চয়ন করতেন, যাকে ঘিরে সূর্য বা ইন্দ্রদেবের পূজা করা হতো। পূজাশেষে রাজা গাছটিকে প্রথম কুঠারাঘাত করতেন। পারিষদরা সেই বৃক্ষকে কেটে একটি দণ্ড বের করতেন। দণ্ডের মাথায় বসানো হতো কাপড় দিয়ে মোড়া মস্ত ঘেরওয়ালা একটি বাঁশের ছাতা। ইঁদপরবের দিনে রাজা ছাতার দণ্ড ধরে তাকে উত্তলন করতেন এবং কৃষিকার্যের খোঁজ নিয়ে প্রজাদের খাজনা ধার্য করতেন। সেই ঐতিহ্য মেনে এখনও ছাতা পরব হয়ে চলেছে।

তো, সেদিন বরাবাজারের পরব টাঁইড়ে গ্রামবাসীদের খুব ভিড়। ভিড়ের মধ্যেও গাছতলে একটি সাঁওতাল শিশুকে দেখে গুলজারির মায়ের মনে ধরে যায়। স্বামীকেও সে-কথা জানায়। তারা শিশুটির মা-বাবা এবং সঙ্গে আরো যারা ছিল তাদের কাছে যায়।

'হ্যাঁ গো, তুমাদের বাবুটার কী নাম?' গুলজারির মা জানতে চায়।

'ইয়ার নাম? মনপূরণ হাঁসদা।' মনপূরণের মা হাসি মুখে জানায়।

'তুমরা কন গাঁয়ের ব-ঠ?'

'এইঠিনেরেই বঠি। বরাবাজারের। আর তরা কথাকার?'

'হামার বাপের ঘর লাকায়—লাকা-পলাশবনি। বাপের ঘরকে আইসেছি। শ্বশুরঘর খটংগায়। কোটশীলার পাশে।'

'বুঝলি। জয়পুর লাইনে?'

'হঁ, হঁ। ত, বলছি কি, তুমাদের ছ্যেলাটাকে দেখে হামাদের দমে ভাল লাগছে। তার হতে বলছি,' গুলজারিকে দেখিয়ে তাদের বলা হয়, 'তুমাদের বাবুটার সঙে হামাদের এই বাবুটার ফুল

পাতাবে গো? জুড়িপাড়ি বঠে।' 'জুড়িপাড়ি' অর্থাৎ সমবয়সী। আর 'ফুল পাতানো' মানে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা।

প্রস্তাবটি দেওয়াতে তারাও বাচ্চা গুলজারিকে দেখে। দুটিকে পাশাপাশি রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়। সবাই রঙ্গ দেখে তাদের। শিশু দুটি দিব্যি নিজেদের মধ্যে খেলতে শুরু করে। তা দেখে দুই পরিবারের সকলের ভালো লাগে এবং তারা ফুল পাতাতে রাজি হয়ে যায়।

তৎক্ষণাৎ দু-পক্ষই মিঠাই-জিলপি আর ফুলমালা নিয়ে আসে। বাচ্চা দুটি একজন আরেক জনকে মালা পরিয়ে দেয়। বাচ্চাদের হাতে মিষ্টান্ন দেওয়া হয়, নিজেরাও মিষ্টিমুখ করে। এটা একটা খুব আনন্দের মুহূর্ত।

সেই দিন থেকে শিশু দুটি পরস্পরের 'ফুল' হয়ে যায়, নাম না ধরে 'ফুল' বলে সম্বোধন করে। নতুন এই সম্পর্কের সূত্রে একশিশুর মা-বাবা অপর শিশুর 'ফুল মা', 'ফুল বাবা' হয়।

দুই শিশু তথা পরিবারের মধ্যে এই সম্পর্ক খুবই গভীর এবং সম্মানের হয়ে থাকে। বিভিন্ন কাজে-ভোজে একঘর আরেক ঘরকে ডাকাহাঁকা করে, বিপদে-আপদে সাহায্য করে, একে অপরের কাছ থেকে শলা-পরামর্শ নেয়। পরব-তিওহারে উপহার পাঠায়—চাষের কাঁচা তরকারি, বাঁধের মাছ, আম-কাঁঠাল, মাটির হাঁড়িভর্তি গুড়পিঠা-গুলাপিঠা, বোঝা বাঁধা গাদর জনহার ইত্যাদি। বছর-বছর ধরে এই সম্পর্ক অটুট থাকে।

সেদিনের ছোট্ট গুলজারি আজ চল্লিশ পেরিয়ে দু-বিটির বাপ। ভাদি-বিন্তি। কিন্তু এখনও ফুলঘর তাকে খুব টানে। মামাঘরও বরাবাজারের কাছে কিন্তু মামাঘর যেতে চায় না। বাপ-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে সে সটান ফুলবাবা-ফুলমায়ের কাছে চলে যায়। দু-চারদিন থেকে আসে। ফুলঘরে তার কত খাতির। লাল মুরগার ঝোল, হাতি কাঁদর চালের ভাত, জারা বিরহির ডাল। একেক দিন মনপূরণ গুলজারিকে বলে, 'চলো ফুল, আজ বাঁধে জাল ফেঁকা যাক।' অমনি ৪-লাগার বাটাই জল কাঁধে নিয়ে দুই ফুল মিলে পুকুরে যায়—সের-আধসের ওজনের কাতলা ধরে আনে। মহুলতলে ঝুমুর গায়। সকাল-বিকাল ফুলের সঙ্গে তার কত ঘুরাঘুরি, কত গল্প!

তবে এবারে বাপের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে সে কোথায় যে পালাল তা কেউ বুঝতে পারছে না। ফুলঘরে খবর পাঠানো হলে গুলজারির ফুলবাবা লাইন-বাসে ড্রাইভারের বুক পাকিটে চিঠি গুঁজে দিয়ে জানিয়েছে, 'না, ফুলব্যাটা ত আসে নাই। তুমরা খোঁজ-খবর কর আর হামরাও দেখছি। মনপূরণ মটস্ সাইকেল বাইর্ করছে। একবেলা রুয়ারুয়ি করে কালেই এলাকার ঝুমৈরাদের পাশকে খোঁজ লিতে যাছে।'

কিন্তু এখন তো গ্রামে কোথাও কোনো ঝুমুর-ছৌনাচ-ডাঁইড় নাচের অনুষ্ঠান হয় না। সবাই চাষ নিয়ে ব্যস্ত। তাহলে? কোথায় যেতে পারে, গুলজারি?

তিনচার দিন পরেও গুলজারি খটংগায় এলো না। গ্রামের মানুষও তার ব্যাপারে কেউ কিছুই বলতে পারছে না। বরং তারাই রোজ খবর নিচ্ছে সে ফিরে এলো কি না। কেউ কেউ জানতে চাইছে সংসারে কার সঙ্গে কী হয়েছিল যার জন্য সে বউ-বিটি-ঘরসংসার ছেড়ে চলে গেল?

ঘরের লোক ধরেই নিয়েছে সে আর গ্রামে ফিরবে না। খাসি বিকা টাকায় যা হোক নিজের কিছু একটা ব্যবস্থা করে দূরে কোথাও আলাদাই থেকে যাবে। সে এমন কোথাও তার একার জীবন শুরু করবে, যে-জীবনের খবর তার বৃদ্ধ বাবা-মা জানতে পারবে না। জীবনের শেষ কটা বছর হয়তো পুত্র শোক নিয়ে চলে যেতে হবে তাদের। আফশোস থেকেই যাবে। ব্যাটাকে তাদের শেষ দেখা আর হবে না। তারা পাপীষ্ট। তাই মৃত্যুর সময় বড় ব্যাটার হাতে গঙ্গা পাবে না, মুখে আগুনটুকুও পাবে না। ভাবতে গিয়ে চোখের জল সামলাতে পারে না হাজারি। তার এখন অনুতাপ হয়, সে কেন অমন করে ব্যাটার সঙ্গে ঝগড়া করল? তার যখন সংসারে মন নাই, তখন কেন তাকে জোর করে কটু কথা বলে সংসারের জাঁতায় পিষতে চেয়েছিল? ব্যাটা ঝুমুর লিখতে ভালবাসে, গাইতে ভালবাসে, বাপ হয়ে হাজারি

কেন তাকে তার ভালো লাগার কাজ নিয়ে থাকতে দিল না? যদি দিত, তাহলে আজ এমন করে তাকে মনোক্লেশ নিয়ে পীড়িত হতে হতো না। এমনভাবে অব্যক্ত কষ্টকে বুকের ভেতরে লালন করতে হতো না।

ক্ষেতে লাঙল ঘুরাতে ঘুরাতে ছেলেকে আর গালাগাল করে না হাজারি। ববং ভগবানের কাছে মঙ্গল কামনা করে। মনে মনে ব্যাটাকে বলে, 'হামি ভাল লই বাপ! হামি তকে বড় দুষ্টু কথা বলেছি। ভগবান হামাকে দণ্ড দেক, তকে সুখ দেক। ইচ্ছা পূরণ করুক তোর।'

বড় রাস্তার দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে বৃদ্ধা মা। 'ব্যাটারে, কনদিগে গেলি!' কপাটে হেলান দিয়ে চৌকাঠের পাশে বসে বসে বুড়ি চোখের জল মোছে। 'হ্যাঁ ব্যাটা, হামরা তোর দুশমন বঠি? এত করে বললি তাও তুঁই চলে গেলি? হামাদের এমন শোকে ফেলে দিঁয়ে গেলি। ও-হো-হো-হো!'

নাবালিকা মেয়ে দুটিও কাঁদছে। বাপের জন্য। কতদিন দেখতে পায়নি। তাদের এখন সঙতিদের সঙ্গে কুলহিতে জলে-কাদায় এক্কাদোক্কা খেলায় মন নেই। হরিমন্দিরে-মনসা মেলায় লুকাঝুড়ি-ছুয়াছুয়ি খেলতেও যাচ্ছে না। দল বেঁধে হইহই করে বাঁধের পাড়ে, ক্ষেতের ধরে তাল কুড়াতে বেরিয়ে পড়ছে না। শুকনো মুখ করে মায়ের পিছু-পিছু ঘুরছে আর জানতে চাইছে, 'মাঈ গ, বাবা ক্যানে নাই ঘরকে আসছে বল ন? কবকে আসবেক?'

কোনো জবাব দিতে পারে না ভাদি-বিন্তির মা। সে কাঁদেও না। দুশ্চিন্তায় পাথর হয়ে আছে। কালি-মাড়া মুখ। মাথায় তেল-চিরুনি পড়েনি। সিঁথিতে সিঁদুরের ঔজ্জল্য নেই। তেলচিকুটি শাড়ি। ফাটা গোড়ালিতে আলতার ছোঁয়া নেই। মন মরে গেছে তার। হয়তো ভাবছে, তাকে ছেড়েই চলে গেল লোকটা। নতুন করে কোথাও সংসার করবে, আনন্দে থাকবে বলে। সে তো তাকে কোনোদিন হাসিখুশি রাখতে পারেনি। খুঁট দিয়ে নিঃশব্দে চোখ মোছে সে।

রাঁধাশাল এখন কোলাহলহীন। আগের মতো বাসন-কোসনের শব্দ হয় না। কাঠের আগুনে জনহার পুড়ার গন্ধ আসে না। আঙিনায় ছেলেমেয়েদের ছোটাছুটি নেই, যখন-তখন হড়াস-হড়াস খাট পাতা নেই। ছাগল ডাকে না। গরুবাছুরও হামলায় না। গোটা খটংগার মানুষ যখন দ্রুত চাষের কাজ শেষ করে মনসা পূজায় মেতে উঠতে চাইছে, যখন বাখৈলে-বাখৈলে চালগুড়ি, গুড়, তেল কিনে এনে গুড়পিঠা-তালের বড়ার আয়োজন করছে, হাট থেকে হাঁস কিনে, পেটে চেপে, যে-যার ঘরে ঢুকছে, ছোট ছোট মেয়েরা তেল-চপচপে মাথায় শিংয়ের মতো ঝুঁটি বেঁধে ঘরের দুয়ারে নাচতে নাচতে কালো মুখ করে ভুট্টা পোড়া খাচ্ছে, তখন তাদের ঘরে শুধুই অন্ধকার—দেয়ালের মাথায় কৃকলাসের মতো বসে থাকে। এখনও আফর রোয়া শুরুই হয়নি, ঠাকুর থানে পূজা দেওয়ার জন্য হাঁসও কেনা হয়নি। গুড়পিঠা, গুলাপিঠা কিছুই হচ্ছে না। ঘরে পাকাতালের গন্ধও নেই। সারা সংসার জুড়ে শোক যেন তাদের কণ্ঠ রোধ করে রেখেছে।

মনসা মেলায় চলছে মাইক বাঁধাবাঁধি। মঞ্চ করা হচ্ছে সারারাত জাঁতগান হবে বলে। আজ বার, কাল পূজা।

হঠাৎ ছুটতে ছুটতে আসে মহন গরাঁইয়ের ছুটু ব্যাটা। নাক নোংরা, কোমরের লাল ঘুনসিতে একগুচ্ছ ভেলা-কড়ি ঝুনুক-ঝুনুক বাজছে। দূরে মহুলতলে গুলজারিকে দেখতে পেয়েছে সে। পড়িমড়ি করে এসে খবর দেয় গুলজারির মাকে, 'এ জেঠি, এ জেঠি! চল দেখবি চল! গুলজারি আসছে ঝুমের গাঁইহে!'

'কুথায় দেখলিরে?'

'হামি দেখলি। মহুলতল হয়ে আসছে।'

খবর পেয়ে ঘরের সবাই হড়বড় করে বেরিয়ে আসে। মহুতলের দিকে যায়। ততক্ষণে আরো অনেকের কানে পৌঁছে গেছে জুলজারির সেই অনবদ্য মাদলের ধ্বনি। ঘর-ঘর থেকে বেরিয়ে আসে মানুষ। তারা দেখে প্রবল ফুর্তিতে মাদল বাজিয়ে আর ঝুমুর গাইতে গাইতে গ্রামে ঢুকছে

গুলজারি। সঙ্গে ফটিকও। হাতে রসমঞ্জরী খুলে রেখে, গুলজারি গেয়ে চলেছে—

পাঁজর খসিল বঁধু অসুখে-বিসুখে
না দেখিয়া তুমাকে ভাব আছি বড় সুখে
কী সুখ বাঁচনে বল কিবা সুখ মরণে
না উচ্চরিলে কৃষ্ণনাম শ্রীরাধার মুখে
সখি, আছি বড় সুখে...

গুলজারিকে দেখে ছেলে-ছোকরাদের কি ফুর্তি! কেউ কুলকুলি দেয়, কেউ হাততালি দিয়ে সাধুবাদ জানায় তাকে। ফটিককে নিয়েই ঘরে ঢোকে গুলজারি। খুশিতে তার বউ আড়ালে লুকিয়ে থাকে।

গুলজারি বাবা-মাকে প্রণাম করে। তাদের হাতে বই তুলে দেয়। আর দেয় ছাগল বিক্রির দরুণ সব টাকা। বই থেকেও অনেক টাকা তার হাতে এসেছে। তাও দিয়ে দেয়। বই সব বিক্রি হয়ে গেছে।

ব্যাটার এই কাণ্ড দেখে বাপ অবাক! সে যে কোনোদিন বইও লিখতে পারে ভাবতেই পারে না হাজারি। তার আনন্দ ও গর্বের শেষ নেই। বই দেখতে তখন ঘর-দুয়ারে গ্রামবাসীদের ভিড়। বই ঘুরছে হাতে হাতে।

'ভাদি-বিন্তির মাঈ! কনদিগে গেলে তুমি?' চশমা পরেই হাঁক দেয় গুলজারি।

বউ ঘটিতে তার জন্য পা ধোওয়ার জল নিয়ে আসে। গামছা আনে। ভাদি-বিন্তি নাচতে নাচতে বাপের থলি ধরে টানে। গুলজারি শালপাতের ডোঙালাভর্তি মিঠাই-জিলপি বের করে বউকে দেয়। বলে, 'লাও, সবাইকে দাও! মাকে ডাক।'

হাজারি ফটিককে হাত ধরে ঘরে টেনে আনে, 'এ বউ! এই শালা গুন্ডাটাকে আগে দুটা জিলপি দে। শালা নকি সালকায় গেছল। মামাঘরকে। ইয়েই মূল খেড়ি বঠ।'

দাদুর খুশি দেখে হাসতে থাকে ফটিক।

*****

The Old Indian Man – *Painting by Soumya Bhattacharjee*

প্রেমের নদী আন্ধারমানিক

সেলিনা হোসেন

শেষ পর্যন্ত অপেক্ষার প্রহর গোনা শেষ হয় তারানার। ভালোবাসার মানুষ পাওয়ার যে হাহাকার বুকের মধ্যে ছিল সেই দম-আটকানো অবস্থা আর নেই। এখন ওর বুকের গভীরে বয়ে যায় আন্ধারমানিক নদী। নদীর ধারে চুপচাপ বসে থাকে ও। নদীর দিকে তাকিয়ে বুক ভরে যায় তারানার। স্বামীর সংসারে এই নদী ওর আনন্দের সঙ্গী। আশেপাশের মানুষেরা জানে ও নদীর ধারে বসে থাকতে ভালোবাসে। তারেকের সঙ্গে প্রেম হওয়ার পরে এই বসে থাকা আরও গভীর আনন্দের হয়েছে। জীবনে এমন একটি সময় আসবে এমন ধারণা স্বপ্নেও ছিলনা। ওকে নদীর ধারে বসে থাকতে দেখে একদিন তারেক ওর ছোট্ট নৌকাটা পাড়ে ঠেকিয়ে নেমে এসেছিল। কাছে এসে বলেছিল, আপনি আমাদের গাঁয়ের বউ। আপনার মতো নদীর ধারে এমন করে কেউ বসে থাকেনাই। আপনি নদী খুব ভালোবাসেন না?

--হ্যাঁ, খুব ভালোবাসি। আমার বাবার বাড়ির ধারে নদী ছিলনা।

--আমি এই নদীতে মাছ ধরি।

--হ্যাঁ, জানি। আমি আপনাকে দেখেছি নৌকা নিয়ে চলে যেতে। আমার মনে হতো আমিও যদি এমন নৌকা বেয়ে যেতে পারতাম।

--খয়ের ভাইকে বলেন না কেন?

--ও এসব পছন্দ করেনা। খালি ভাত রানতে বলে। কোথাও একটু বেড়াতেও নিয়ে যায়না।

--আমি নিয়ে যাব। যাবেন আমার সঙ্গে নদীতে ঘুরতে?

--যাব, যাব। অনেক দূরে যাব।

--কবে দিন ঠিক করেন।

--আচ্ছা দেখি।

--আজ আমি আসি। আমার খুব ভালোলেগেছে আপনার সঙ্গে কথা বলে। আপনি দেখতে যেমন সুন্দর, আপনার কথাও তেমন সুন্দর। আমি সুযোগ পেলে আপনার সঙ্গে বসে গল্প করব। আন্ধারমানিক দুচোখ ভরে দেখবে আমাদেরকে।

--ঠিক। একদম ঠিক। আমি এমনই নদীচাই।

--আজকে যাই। আবার আসব। তারানার দু'চোখে উজ্জ্বল হাসি ছড়ায়। সেদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় তারেক। নৌকায় উঠে হাত নাড়ায়।

জমে ওঠে প্রেমের খেলা। তারানা রোজ বিকেলে এসে বসে নদীর ধারে। সূর্য পশ্চিম আকাশে চলে যায়। বিকেলের ফিকে আলো ছড়িয়ে থাকে চারদিকে। যতদূর দৃষ্টি যায় ফিকে আলোর স্নিগ্ধতা ওর মনোজগতে ভিন্ন আবেশ তৈরি করে। বিকেলের স্নিগ্ধ বাতাস ওকে ছুঁয়ে ছড়িয়ে যায় চারদিকে। এখন ওর জীবনে অন্যরকম সময় এসেছে। জীবনের এমন মধুর সময় ও ছাব্বিশ বছরে পায়নি। এ এক পরম পাওয়া। আন্ধারমানিক নদীর দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, নদীরে তুই আমার জীবনে এখন শুধু জোয়ার। আমার নদীতে ভাটির টান নাই। প্রেম তো জোয়ারই।

অনেকদূরে জেলেরা নদীতে মাছ ধরে। ও নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে। নিজেকে বলে ওখানে আমার প্রেম আছে। আমি প্রেমের নদীতে ডুবে থাকি। আন্ধারমানিক নদীতে ভেসে বেড়াই আমি। তারেক আমার আন্ধারমানিক। ও আমার জোয়ারের জল। আমাকে বলে, তুমি আমার ফুলের কুঁড়ি। গাছের ছায়া। নানা উপমায় মন ভরিয়ে দেয় তারেক। দুজনের খুনসুটিতে ভরে ওঠে পড়ন্ত বিকেল। প্রতিদিন দেখা হয় না। চারদিকের লোকচলাচল দেখে তারেক আসে। নইলে মানুষের চোখে পড়বে ওদের সম্পর্ক।

একদিন তারেক জিজ্ঞেস করেছিল, খয়ের মিয়া তোমাকে কি নামে ডাকে?

তারানা শুকনো মুখে বলেছিল, হারামজাদী।

--কি বললে?

--হ্যাঁ, এই শব্দে ডাকে।

--যাক ভালোই হয়েছে। আমার প্রেমই তোমার জীবনে প্রথম।

--তুমি আমার আন্ধারমানিক। এই নদীর ধারে বসে আমার কাছে প্রেম এসেছে।

--একদিন বনের মধ্যে হাঁটতে যাব দুজনে। বুকে জড়িয়ে ধরব তোমাকে।

উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ে তারানা। তারেক মৃদু হেসে বলে, তোমার হাসি নদীর স্রোত। আজযাই।

এভাবে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে তারানার স্বস্তি। কেটে যায় কয়েকমাস।

তারেকের দিকে তাকালে ওর চোখ ফেরেনা। তারেক নিজেও দুচোখ ভরে ওকে দেখে। পলকহীন তাকিয়ে থাকে। ঠোঁটে মৃদুহাসি, যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে বুকে জড়িয়ে। হয়ে যাবে রঙিন প্রজাপতি। এই প্রথম নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। রঙিন দিনগুলো আলোর ফুলকি ছড়ায়। তারানা খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে থাকে। নিজেকে অনেক কষ্টে আড়াল করে।

মাঝেমাঝে ধরা পড়ে যায় খয়েরের কাছে। ও চোখ গরমকরে ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, তোর কি হয়েছে? চেহারায় এত খুশি কেন?

--চেহারায় খুশি দেখা যায় নাকি? খুশি কি চোখে দেখার জিনিস?

--খবরদার, বেশি কথা বলবি না হারামজাদী।

স্বামীর মুখে গালি শুনে নিজেও রেগে ওঠে তারানা। চেঁচিয়ে বলে, তুইও একটা হারামজাদা। দশ বছর ধরে সংসার করলাম পোলাপানের দেখানাই।

--তুই বাঁজা মাইয়া লোক।

--আমি বাঁজা না, তুই বাঁজা। হারামজাদা বেডা একটা।

ক্রুদ্ধ খয়ের বৌয়ের রণরঙ্গী মূর্তি দেখে থমকে যায়। আর কথা বাড়ায় না। ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দেয়। বারান্দায় বসে থাকে তারানা। স্মৃতির পাতায় ফুটে ওঠে বাবা-মায়ের সংসার। ও বিড়বিড়িয়ে বলে, বাবা-মায়ের প্রেমের সংসার। প্রেমের সংসারে হেসেখেলে ও বড় হয়েছে। এখন ও ছাব্বিশ বছর বয়সী। নদীর ধারে বসে জীবনের সুখ খুঁজে বেড়ায়। মাঝেমাঝে ভাবে, সুখ কি? আবার বাবা-মায়ের কথা মনে হয়। দুজনে কলেরায় মারা গেছে। ওর চোখের সামনে মাটিতে গড়াতে গড়াতে সকালবেলা মরে গেছে বাবা। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারিয়েছিল ওর মা। ও নিজেও বাবার বুকের ওপর শুয়ে পড়েছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, বাজান গো, চোখ খোল, চোখ খোল। তোমার চোখেরমণি দেখব।

বাবা চোখ খোলেনি। মাও কলেরায় তড়পাচ্ছিল। কথা বলতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত দুচোখ বন্ধ করে কাত হয়ে ঢলে পড়েছিল। চোখের সামনে বাবা-মায়ের মৃত্যু দেখা জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখের দিন। একদিনের সকাল-দুপুর ছিল তারানার জীবনের দীর্ঘতম সময়। এই সময়কে ও বুঝতে শিখেছিল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। সেদিন তারিখটা ছিল আটই ফাল্গুন। বসন্তদিনের সুবাতাস ও প্রাণভরে নিজেরনিঃশ্বাসে টেনেছিল। পাশাপাশি ব্যাকুল কান্নায় চিৎকার করে মাতিয়ে রেখেছিল ঘরবাড়ি। এই সময়ে ঘটে গেছে ওর পুরো জীবনের ঘটনা। যে ঘটনার রেশ গড়াতে থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত। তখন তেরো বছরের বালিকা ছিল। প্রাইমারি স্কুলের পড়া শেষ হয়েছে। ওদের গ্রামে হাইস্কুল ছিলনা, যেতে হবে পাশের গ্রামের সীমানায়। অনেক দূরে। একা একা এত দূরে পাঠাতে রাজি ছিলনা ওর বাবা-মা। তাই পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গাঁয়ের কেউ কেউ বলেছে, মেয়েটার মাথা ভালো। ওকে ঘরে বসায়ে রাখলি কেন? হোস্টেলে দিয়ে পড়ালেখা করা।

--দিনমজুরি করে ভাত ভাই। কেমন করে হোস্টেলের টাকা দিব? চুরি করতে বলবেন নাকি?

--যা, পাগলামি করতে হবেনা।

--পাগলামি না আযমভাই, কষ্ট। স্কুলের ক্লাশে ফার্স্ট হয়। মাস্টাররা সবাই ওর প্রশংসা করে। আমার কইলজা ভরে যায়।

--লাভ কি তাতে? মেয়েটা তো পড়ালেখায় আগাতে পারলনা। ভালো একটা চাকরিও তো করতে পারবেনা।

মাথানিচু করে দুহাতে চোখ মুছে ছিল ওর বাবা হানিফ। বাড়িতে ফিরে ওর মায়ের কাছে একথা বললে ওর মা বাবাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে কেঁদেছিল। ওর বাবা মায়ের কপালে চুমু দিয়ে চোখের পানি মুছিয়ে দিয়েছিল। ও দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। মায়ের কান্না থামেনা দেখে ওর বাবা চোখের উপর চুমু দিয়ে ঠোঁটধরে রেখেছিল। মা হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল বাবার ঠোঁট। তারপর নিজেকে সরিয়ে নেয়। দুজনে বিষন্নমুখে তাকিয়ে থাকে। সেদিন ও বুঝেছিল দুজনে খুবই কষ্ট পাচ্ছে। একসময় আমিনা খাতুন জোরে জোরে বলে, হোস্টেলের খরচের জন্য আমি মানুষের বাড়িতে কাজ করব।

--না, না। আমি তা হতে দেব না।

হানিফ ঘাড় নাড়িয়ে কথা বলে। ঢোক গিলে। নিজের চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে চুল এলেমেলো করে।

--না, না কর কেন? কাজকরে টাকাতো থলিতে ভরব না। মেয়ের পড়ালে খায় খরচ হবে। --মানুষের বাড়িতে কাজ করলেও হোস্টেলের টাকা হবেনা গো□

--ধারদেনা কর। তাও ওর পড়ার খরচ চালাও। মেয়েটার মাথা ভালো, দেখতেও ফুটফুটা।

হা-হা করে হাসে হানিফ। হাসতে হাসতে বলে, মেয়েটার কপাল মন্দ।

--ঠিক বলেছেন বাজান।

তারানা উঁচু কন্ঠে কথা বলে। নিজেও হেসে গড়িয়ে পড়ে। আমিনা খাতুন অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। পড়ালেখা হবেনা। এ নিয়ে কি ওর দুঃখ নাই? হানিফ ওর মাথায় হাত রেখে বলে, মা রে তুই ছাড়া আমাদের তো আর পোলাপান নাই। তোরে...

--থাক বাজান থাক, কষ্টের কথা আর বলতে হবেনা। আমি আপনাদের কাছে থাকব। আমিও দিনমজুরি করব। অন্য কোথাও যাবনা।

--তাহলে তোকে হাইস্কুলে ভর্তি করে দেই। আমি তোকে পৌঁছে দিয়ে আসব। আবার নিয়ে আসব।

--ঠিক বলেছ। তোমার কাজ থাকলে আমি যাব। আমি ওকে স্কুল থেকে আনব।

--কেন? কেন আপনাদের যেতে হবে? আমি তো একাই স্কুলে যেতে পারব।

--না, তোকে একা যেতে দিবনা। শয়তান পোলাপান তোর পিছে লাগবে। পাটক্ষেতে, ধানক্ষেতে টেনে নিয়ে যাবে। গায়ের জোরে তুই ওদের সঙ্গে পারবিনা।

হানিফ বলে, তোর চেহারা নিয়ে আমরা খুশিনা। আমরা দুইজনে গলা ধরে কান্দি।

তারানা বাবার কথা শুনে হাসে। রাস্তায় হাঁটলে লোকেরা বলে, ইস, মেয়েটা কি সুন্দর।

বাবা সঙ্গে থাকলে কড়া করে ধমক দেয়।

--খবরদার এমনকথা বলবে না। আমার মেয়ের দিকে তাকাবে না।

--দিনমজুরি করে বেটা দাপট দেখায়।

--কি বললি? দাঁড়া দেখাচ্ছি।

ছেলেটি দৌড়ে চলে যায়। তারানা বাবার হাত চেপে ধরে।

--বাজান আপনি ওদের পিছনে যাবেন না।

--তোর জন্য চিন্তায় মরে যাই।

--কেন আমার কি হবে?

--বড় হলে বুঝবি। চল যাই।

মেয়ের ঘাড়ে হাত রেখে হাঁটতে থাকে হানিফ মিয়া।

বাবা-মা মরে যাওয়ার পরে চাচার কাছে ছিল দেড় বছর। চাচা ওকে বিয়ে দেয় ওর চাইতে বয়সে দ্বিগুন বড় খয়েরমিয়ার সঙ্গে। লোকটির বয়সের কথা শুনে ও যখন কাঁদছিল তখন চাচা বলেছিল, তুই তো আমার ঘাড়ে বোঝা হয়েছিস। খয়েরকে যৌতুক দিতে হবেনা। বেঁচে গেছি, লোকটার বৌ মরে গেছে। পোলাপান নাই। ভালোই তো হবে সংসার। আরামে থাকবি। অভাবের কষ্ট পাবিনা।

--আমি বিয়ে করবনা।

--খবরদার, একথা বলবি না। বিয়ে দিয়ে দিব। চলে যাবি।

--আমাকে ভাত খাওয়াতে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে?

--চুপ, কথা বলবি না। তোকে পাহারা দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে। এখন স্বামীর কাছে যাবি। আমি রেহাই পাব।

--তাহলে যাই।

তারানা সেদিন দুহাতে চোখ মুছে ছিল। শুধু বাবা-মায়ের কাছে ও প্রেমের স্বপ্ন দেখেছে। ঠিকমতো ভাতখাওয়া হয়নি বাবা-মায়ের কাছে, কিন্তু বুকভরা আনন্দ ছিল। এখন স্বামীর সংসারে পেটভরা ভাত আছে, কিন্তু আনন্দ নাই। প্রেম নাই। শুধু শরীর নাড়াচাড়া আছে। প্রেম ছাড়া এই নাড়াচাড়ায় আনন্দ নাই। ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে, আমি ভালোবাসা চাই। ভালোবাসা।

তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে খয়েরমিয়া। তারানা কে চোখ মুছতে দেখে থমকে দাঁড়ায়।

--কি হয়েছে তোর? কাঁদছিস কেন?

--ভালোবাসার জন্য।

--কেন, তুই ভালোবাসা পাস না?

--না, পাইনা।

--দিব এক লাথি।

খয়েরমিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালে ও দ্রুত সরে পড়ে। তারেকের মুখ ভেসে ওঠে। বুকের ভেতর ধ্বনিত হয় তারেকের কন্ঠস্বর, ফুলকুঁড়ি আমার হাত ধরো। চলো আমরা ভেসে যাই। নদী থেকে সাগরে যাব। তারপর মহাসাগরে। আমাদের প্রেমের মহাসাগর। এমন ভাষা শোনার অপেক্ষায় ছিল ও। শিখেছিল বাবা-মায়ের জীবন থেকে। দুজনে ওর সামনে ভালোবাসার কথা বলে ওকে বুঝতে শিখিয়েছিল ভালোবাসা। কিন্তু' খয়েরমিয়ার কাছ থেকে ভালোবাসার কোনো স্পর্শ পায়নি। বুকের শূণ্যতা কামড়ে ধরে থাকে রাতদিন। বাবা-মায়ের মৃত্যু ওর জীবনে একদিনের সকাল-বিকেল।

তারেকের ভালোবাসা এই সকাল-বিকাল সময় ফুলেফুলে ভরিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে হৃদয়-জুড়ানো সৌরভ। ভাবে, বেঁচে থাকা কি সুন্দর। খয়েরমিয়ার গালমন্দ এখন ওকে আহত করেনা। ওর সামনে নতুন দিনের চিন্তা। তারেকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে নতুন জীবনে ডুবসাঁতার দেবে।

একসময় দুজনের প্রেম গ্রামের মানুষের চোখে পড়ে। নানাকথা কানে আসে খয়েরমিয়ার। নিজেও নদীর ধারে দেখতে পায় দুজনকে।

একদিন নদীরধার থেকে ওকে তুলে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় নদীতে। বলে, যা মর। মরে ভূত হ হারামজাদী।

তারানা ডুবে যায় নদীতে। সাঁতার দিয়ে আবার মাথা তোলে। দেখতে পায় দ্রুত নৌকা চালিয়ে এগিয়ে আসছে তারেক। নৌকা কাছে এনে বলে, উঠে আস ফুলকুঁড়ি। আমার হাত ধরো।

নৌকায় উঠে পড়ে তারানা। ভিজে শাড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, কি হলো আমাদের? খয়েরমিয়া তো আমাকে মরণে ঠেলে দিয়েছে। বলেছে মর।

--ভালোই করেছে। মরণের পরে আমরা এখন বেহেশতে আছি। আন্ধারমানিক আমাদের বেহেশত। খয়েরমিয়ার কাছ থেকে বেঁচে গিয়ে তোমার মরণ হয়েছে। তুমি এখন বেহেশতে। তোমার সঙ্গে আমিও বেহেশতে ঢুকেছি।

--বাহ, সুন্দর।

তারানা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কলকলিয়ে বলে, আন্ধারমানিক আন্ধারমানিক। প্রেমের নদী আন্ধারমানিক। কন্ঠস্বর ভেসে যায় নদীর চারদিক। নদীতে এখন জোয়ারের ভরা টান।

*****

"তুমি হও যমুনা রাধে, আমি ডুইবা মরি।"- *Painting by Poonam Mondal*

অন্ধ বালিশ

শ্যামল ভট্টাচার্য

এবার পুজোর ছুটিতে ইলাদি নিতে আসবে শুনেই মিতু ফোনে বায়না ধরেছিল যে অন্যবারের মতো সোজা কালকা মেইলে চেপে কলকাতা আর সেখান থেকে প্লেনে আগরতলা যাওয়া চলবে না!

- তাহলে কী করবি?
- তুমি তিন-চারদিন বেশি ছুটি নিয়ে এসো, আমরা এবার চেইল ঘুরতে যাবো। সেখান থেকে ফিরে তারপর আগরতলা!

ইলাদি কিছুক্ষণ ভেবে বলে, ঠিক আছে, এখন ভাল করে মন দিয়ে পড়, রেজাল্ট যেন ভাল হয়। তাহলে ঘুরতে যাওয়ার মজাই আলাদা!

মিতু কথা রেখেছে। ইলাদিও।

মিতুর ভালনাম মিস্টি, আর ইলাদি ওর মা; সিঙ্গল প্যারেন্ট। মায়ের বন্ধুরা ওকে ইলাদি ডাকে। শুনে শুনে মিতুও ছোটবেলা থেকে তাই ডাকে। ওর মা এই ডাকটা বেশ পছন্দ করে। তাই বড় হয়েও ডাকে। ইলাদি ছোটবেলা থেকেই ডাকাবুকো। অল্প বয়স থেকেই ট্রেকিং আর রক ক্লাইম্বিং তাঁকে ভীষণ টানে। আর দাদু যখন বেঙ্গালুরুতে পোস্টেড ছিল ইলাদি বছরদুয়েক সেখানকার ফতিমা চার্চের পেছনে সাউথ কোরিয়ান মার্শাল আর্ট তাই কোন ডো শিখেছে। তখন গ্র্যাজুয়েশানের ফাইনাল ইয়ার। এই নেশা চেপে বসায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন আর করা হয়নি। ক্রমে সে তাই কোন ডো-তে ব্ল্যাক বেল্ট, সে বছরই দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে আয়োজিত টুর্নামেন্টে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান। সেই সুবাদেই পরে রেলে চাকরি।

এবছর আগরতলা থেকে কলকাতা এবং দিল্লি সরাসরি ট্রেন চালু হয়েছে। মা রেলের পাস পায়। তাই মিতুর চেইল যাওয়ার আব্দার শুনে এবার দাদু দিদুনকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ওরা অনেক বছর পর রাজ্যের বাইরে বেরিয়েছে। ইলাদি ছোটবেলায় দাদু আর দিদুনের সঙ্গে অনেক জায়গায় ঘুরেছে। কিন্তু দাদু রিটায়ার করার পর ত্রিপুরা ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। এয়ারফোর্সে চাকরি করত। দাদু বলে, সারাজীবন বাইরে বাইরে, নিজের রাজ্যটিকেই ভালভাবে চিনলাম না! কত সুন্দর আমাদের এই ছোট্ট ত্রিপুরা!

কিন্তু নাতনি সানোয়ারের বিখ্যাত কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই তারা সেখানে যেতে চাইছিল। নাতনি ওদের প্রাণ। অনেক বছর পর হিমাচলে এসে দাদু আর দিদুন দুজনেই খুব খুশি খুশি। সিমলা থেকে ৪৫ কিমি দূরে ছোট্ট এই পাহাড়ি শহরটি ইংরেজ আমলে পাটিয়ালার রাজার গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল। ওরা সিমলা থেকে টয় ট্রেনে অনেকগুলি সুরঙ্গ পেরিয়ে সানোয়ার আসে। সেখান থেকে মিতুকে নিয়ে বাসে ধরমপুর হয়ে সোলান আর তারপর উত্তরদিকে সিমলা না গিয়ে পূর্বদিকে চৌরি চাঁদনির কোলে সবুজ পাহাড় আর ঘন অরণ্যঘেরা চেইল শৈলশহরে পৌঁছে যায়। এখানে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে দিনের বেলায় একরকম তাপমাত্রা, কিন্তু বিকেল থেকেই শীতল বাতাস, সন্ধ্যায় বেশ শীত, আর রাত যত গড়ায় ঠান্ডা হাওয়ার দাপট বাড়তে থাকে।

এখানে দ্রষ্টব্যের অন্যতম চেইল রাজপ্রাসাদ, এর একটি অংশ স্টার হোটেলে রূপান্তরিত হয়েছে। সামনে মিউজিয়াম। আর রয়েছে বিশ্বের উচ্চতম আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম। মিতুরা উঠেছে রাজপ্রাসাদ থেকে বেশ দূরে, মূল জনপদের বাইরে একটি হোটেলে। এখানে ঘুম ভাঙ্গে মোরগের ডাকে। তাছাড়া নানা রকম পাখির কলকাকলি এই শীতল আরণ্যক সকালকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। অদূরেই চৌরি চাঁদনি শৃঙ্গে তুষারের আস্তরণ। দাদু, ইলাদি আর মিতুর প্রথম সকালটি কাটে হোটেলের পেছনের বাগানে। বেশ ঠান্ডা। দিদুন বরাবরই সকালে ঘুমুতে ভালবাসে, তাই বিছানায়। বাগানে একটি বড় পাথরের ছাতার নিচে ফাইবারের টেবিল চেয়ার পাতা। ওদেরকে দেখে সেখানেই হোটেলের বেয়ারা চা দিয়ে যায়। দূরে পাহাড়ের

গায়ে একটি মন্দির দেখিয়ে সে বলে, কালী-কা–টিক্কা, এখানকার কালীমাতা খুব জাগ্রত। দেখে আসতে পারেন! কাছাকাছি পাহাড়ের কোলে রয়েছে গুরুদ্বার। প্রতি রবিবারে পাটিয়ালার রাজা ওখানে গিয়ে প্রার্থনা করত।

দাদু ওকে প্রশ্ন করে আরও কিছু বিস্তারিত তথ্য নেয়। তারপর বলে, আমরা এখানেই ব্রেকফাস্ট করবো, ঘণ্টাখানেক পরে দিয়ে যাবেন! বেয়ারা মাথা নেড়ে চলে যান। একঝাঁক টিয়ার গায়ের রং গাঢ় সবুজ। আকারেও বেশ বড়।

মিতু বলে, দাদু রাতে দেখেছ আকাশের তারাগুলি এত কাছে যেন মনে হয় হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে!

দাদু হেসে বলে, হ্যাঁ, ফাইবার গ্লাসের এত বড় বড় জানালার মজাই আলাদা, আকাশ পরিস্কার থাকলে চাঁদ তারাদের দেখা যায় আর তুষারপাতের সময়ও নিশ্চয়ই-

একটু থেমে চোখ বড় বড় করে নিচু আওয়াজে বলে, জানিস, কাল শেষরাতে তোর দিদুন এই বাগানে ইয়েতি দেখেছে!

মিতু প্রথমে চমকে যায়। তারপর হেসে বলে, দাদু, ভুলে যেও না যে আমি এখন বড় হয়েছি, ক্লাশ এইটে পড়ি! ইয়েতি তো তিব্বত, নেপাল আর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে গল্পের চরিত্র, এর অস্তিত্ব এখনও প্রমাণিত হয়নি!

ইলাদি হেসে বলে, বাবা ভাবে এখনও নাতনিকে যে কোনও গল্প বলে ভোলাতে পারবে!

তখনই পেছন থেকে দিদুন বেরিয়ে এসে ওদেরকে চমকে দিয়ে বলে, গল্প না মা, এটা সত্যি! ভোরের একটু আগে বাথরুমে গেছি, বেরিয়ে বিছানায় ওঠার আগেই ঐ বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে রডোডেনড্রন ঝোপের দিক থেকে হোটেলের দিকে হেঁটে আসতে দেখি সাদা লোমওয়ালা লম্বা মানুষের মতো কিছু একটা। আলো কম থাকায় মুখ দেখতে পাইনি! তোর বাবাকে ডাকলাম। কিন্তু তিনি উঠে আর কিছু দেখতে পাননি। দরজা খুলে বেরুতে চাইলো, আমি বেরুতে দিইনি!

মিতু বলে ওঠে, আমাদের ডাকোনি কেন? ইন্টারকম তুলে বললেই হতো! ইলাদি হাত তুলে ওকে ইশারায় চুপ করতে বলে। বেয়ারা সকালের খাবার নিয়ে আসেন। ইলাদি তাঁকে জিজ্ঞেস করে, কাছাকাছি কোনও চিড়িয়াখানা আছে?

বেয়ারা মাথা নেড়ে বলে, না, এখানে তো টুরিস্ট কম আসে, তাই হয়তো- , তবে এখানে এমনি পাহাড় থেকে অনেক জন্তু জানোয়ার নেমে আসে, বিশেষ করে শেয়াল আর হায়েনা - সেজন্যে টুরিস্টদের রাতে বেরুনো মানা!

দিদুন বলে, হ্যাঁ, ম্যানেজার কাল আমাদেরকেও রাতে বেরুতে মানা করেছেন! কিন্তু-

- কিন্তু কী মাইজি?
- আমি ভোরের দিকে ইয়েতি দেখেছি-
- ইয়েতি কোন জানোয়ার মাইজি?
- তুষার মানব! ঐ দেওয়ালের দিক থেকে এসে হোটেলে ঢুকেছে? তোমরা কখনো দেখোনি?

বেয়ারা মাথা নাড়ে, না মাইজি, আর কোনও টুরিস্টও কখনও বলেনি! আমরা ছোটবেলায় মিচে'র কথা শুনেছি, মানুষ ভালুক, উপত্যকায় যখন বরফ পড়তো রাতের আধারে নেমে আসতো খাবারের খোঁজে... এছাড়া ছোটবেলায় জংলি মানুষ মিগোই এর কথাও শুনেছ... কিন্তু এখানে বাস্তবে, না মাইজি, আপনি ভুল কিছু দেখেছেন, এ নিয়ে আর কাউকে বলবেন না প্লিজ -

ইলাদি গম্ভীরমুখে বলে, ঠিক আছে যান! তোমরাও তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, ঘুরে সন্ধ্যের আগেই ফিরতে হবে! আবহাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী বিকেলের দিকে বৃষ্টি হতে পারে, কিম্বা তুষারপাত-

সকালের খাবার সেরে ওরা তৈরি হয়ে মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে হোটেলের লাল জিপসি করে ভ্রমণে বেরোয়। কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যেই আকাশ মেঘে

ঢেকে যায় আর একটু পরেই শীতল বাতাস বইতে থাকে। কালিমন্দির কিম্বা গুরুদ্বারে তেমন ভিড় নেই। নতুনত্বও কিছু নেই। কিন্তু মন্দির চত্বর আর গুরুদ্বারের আশেপাশেও সেই গাঢ় সবুজ বড় আকারের টিয়ার ঝাঁক। আর সেই উচ্চতা থেকে প্রকৃতির নিসর্গ অসাধারণ! চোখ জুড়িয়ে যায়।

প্যালেস হোটেলের বাইরে একটি ধাবায় ওরা দুপুরের খাবার খায়। দেশি ঘিয়ে ভাজা আলু পরোটা, দই আর স্যালাড। এখানকার লঙ্কা বেশ ঝাল, মূলো আর টমেটোর আকার বেশ বড়।

প্যালেসের ভেতরটি ছিমছাম সাজানো। মিউজিয়ামটি ছোটর মধ্যে সুন্দর। থরে থরে বন্দুক পিস্তল ঢাল তলোয়ার আর কিছু বর্ম, এছাড়া রয়েছে রূপো, কাসা, পিতল, পোর্সেলিন ও চিনেমাটির বিভিন্ন বাসন। তবে মিউজিয়ামটি আকারে তেমন বড় নয়। ভেতরে হাল্কা ভাখ লোকসঙ্গীতের সুরের মূর্ছনা পরিবেশে কেমন উৎসবের আবহ তৈরি করে দেয়! যে উৎসবে হুল্লোড় নেই, অথচ আভিজাত্য আছে। সন্তুরের অনুষঙ্গে ভাখই বোধহয় একমাত্র লোকগীতি যা উচ্চকিত না হয়েও অচেনা শ্রোতার মনে ঢেউ তুলতে পারে। সেখানেও তেমন পর্যটকের ভিড় নেই। ওদেরকে দেখে সুসজ্জিত প্রহরীরা প্রত্যেকে হাতজোড় করে অভিবাদন জানায়। ওরাও প্রতিনমস্কার করে।

দাদু বলে, আমাদের রাজ্যের উজ্জ্বয়ন্ত প্রাসাদ কিম্বা নীরমহলে এরকম আতিথেয়তা, এরকম আবহ গড়ে তুলতে পারলে, নিশ্চিতভাবেই পর্যটক বাড়বে।

সন্ধ্যার আগেই হোটেলে ফিরে ওরা গিজারের গরম জলে করে করে। এটা দিদুনের নির্দেশ, সারাদিন যেখানেই ঘোরো না কেন, ফিরে এসে একটু পরেই স্নান করে নিলে ক্লান্তি দূর হওয়ার পাশাপাশি শরীরও সুস্থ থাকে।

রাতে ওরা গরম গরম বাসমতী চালের ভাতের সঙ্গে খায় একটি প্রায় আটশোগ্রাম ওজনের আস্ত কুল্লু ট্রাউট। ধনেপাতা, টমেটো, কাচালঙ্কা চেরা আর লেবুর টুকরো দিয়ে সাজানো। এটার অর্ডার ইলাদি অনলাইনেই করে দিয়েছিল। দিদুন নাক সিটকে বলে, ভাল করে ভেজেছে তো? আস্ত মাছ দিয়েছে যে রে!

ইলাদি বলে, আহ মা, এটা হিমাচল প্রদেশের সেরা আমিষ ডেলিকেসি। প্রথমে মাছকে ম্যারিনেট করে নুন, কারি পাতা, ধনে গুঁড়ো, সামান্য লঙ্কা গুঁড়ো, ছোট টুকরো করা লেবুর খোসা, লেবুর রস আর সর্ষের তেল মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে তারপর অল্প আঁচে ভেজে নেওয়া হয়।

দাদু জিজ্ঞেস করে, আর এই কাসুন্দির মতন হলুদ সসটা কী দিয়ে বানায় জানিস? একেবারেই অন্যরকম স্বাদ!

ইলাদি বলে, পেঁয়াজ আর সর্ষে দিয়ে!

বলতে বলতে চামচ দিয়ে মাছটার পিঠের দিক থেকে ভেঙে মুখে দিয়ে খেয়ে বলে, ফাইন! বাবার তো বেশি পছন্দ হবে, ... মিতু খেয়ে দেখ, ... তোমারও ভাল লাগবে গ্যারান্টি দিচ্ছি মা, ভেঙে ভেঙে খাও, ...অল্প মশলা থাকায় ট্রাউটের সমস্ত খাদ্যগুণ আর অরিজিনাল স্বাদ পাবে!

দাদু চেখে বলে, সত্যি খুব টেস্টি! সঙ্গে সেদ্ধ সব্জি আর গরম গরম বাসমতী চালের ভাতে ঘি, আহা, থ্যাঙ্ক ইউ মা, এই স্বাদ জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না!

দাদুর মুখে প্রশস্তি শুনে ইলাদির চেহারা খুশিতে ঝলমল করে ওঠে।

এবার দিদুনও খায়। মুখে দেওয়ার পর আগের বিরক্তিভাব আর থাকে না। আর দিদুন খেতেই তাঁর চেলি মিতুও খায়, সঙ্গে ডুমা ডুমা করে কাটা আলু, পেঁয়াজ, টমেটো, গাজর, স্কোয়াশ, মুলো আর সিম সেদ্ধ! খেতে খেতে বোঝা যায় যে সত্যি একটা কখনও ভুলতে না পারা খাবার খাচ্ছি।

দিদুন জিজ্ঞেস করে, এই একটা আস্ত মাছের দাম কত?

ইলাদি বলে, তুমি খাও না মা, ঘুরতে বেরিয়ে সবসময় দাম টাম নিয়ে ভাবলে চলে না, খরচ হবে জেনেই তো এসেছি!

এই কদিন দাদু আর দিদুনকে কোনও খরচ করতে দিচ্ছে না ইলাদি। মিতু মনে মনে ভাবে, সে-ও বড় হয়ে এরকম ইলাদিকে কোনও খরচ করতে দেবে না! অবশ্য ইলাদি কিছু কিনে উপহার দিতে চাইলে সেটা ও নেবে। ইলাদির উপহার পেলে ওর বড়দিনে সান্তা ক্লজের গিফট পাওয়ার মতন আনন্দ হয়।

খাওয়ার পর ওরা আবার লনে পাতা ফাইবারের টেবিল চেয়ারে বসে আড্ডা মারতে চায়। দিদুনের দ্বিধা ছিল। ইলাদি সাহস দেয়, আমরা সবাই থাকলে কোনও ইয়েতি আসার সাহস পাবে না মা!

তখনই ঠান্ডা হাওয়ার দাপট থেমে যায়। আর ওরা গুছিয়ে লনের চেয়ারে বসার আগেই গুড়ি গুড়ি স্যাকারিনের মতন তুষারপাত শুরু হয়ে যায়। ওদের সোয়েটার টুপিতে মিহি তুষারপাত সবার মনে পুলক জাগায়। মিতু আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।

কিন্তু ইলাদি বলে, চলো সবাই, রুমে যাই। সারারাত যদি বরফ পড়ে তাহলে কাল বরফের বল বানিয়ে খেলা যাবে!

দোতলায় দুদিকের দুটি কর্নার রুমে উঠেছে ওরা। প্রত্যেক রুমের দুদিকে ফাইবারের বড় বড় পারপ্লেক্স লাগানো স্লাইডিং জানালা। দাদু চাবি ঘুরিয়ে নিজেদের ঘরের দরজা খুললে ইলাদি মিতুকেও ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকতে বলে। দিদা জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছিস?

ইলাদি বলে, নিচে, ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে আগামীকালের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করবো!

ইলাদি বেরিয়ে গেলে দিদুন রুম হিটার অন করে ধীরে ধীরে জামাকাপড় পালটে নেয়, তারপর মিতুদের রুমের চাবি খুলে সেখানেও রুম হিটার অন করে। মিতুও পোশাক পালটে ঘরের পোশাক পরে নেয়। ততক্ষণে ইলাদি চলে আসে।

দিদুন জিজ্ঞেস করে, কি বললেন ম্যানেজার, সকালে কখন বেরুবো আমরা?

ইলাদি মুচকি হেসে বলে, শুনলাম সব, আবহাওয়া অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেব!

তারপর ইলাদি পোশাক পাল্টে বাথরুমে যায়। দিদুন কিছুক্ষণ কথা বলে চলে যাওয়ার সময় মিতু ইয়ার্কি মেরে বলে, আজ রাতে আবার ইয়েতি দেখলে ইন্টারকমে ডেকো, আমরাও দেখবো!

দিদুনও হেসে বলে, তুই যে কত বড় বীরাঙ্গনা তা আমার জানা আছে! নিজের চোখে দেখলে হয়তো ভয়েই অজ্ঞান হয়ে যাবি! হ্যাঁ, তোর মা ছোটবেলা থেকেই সাহসী!

মিতু বলে, ভুলে যেও না, আমি এখন ছোট নেই, হস্টেলে একা থাকি!

ইলাদি বলে, গুডনাইট মা, আমার ভীষন ঘুম পাচ্ছে, তবে মিতু ভুল বলেনি, সত্যি সত্যি কিছু দেখলে ডেকো!

দিদুন গুডনাইট বলে মাথা নেড়ে বেরিয়ে যায়। মিতু বাথরুম সেরে এসে কম্বলের তলায় শুয়ে পড়ে। ইলাদিও রুম হিটার বন্ধ করে কম্বলের তলায় ঢোকে। তারপর বেডসুইচ টিপে লাইট অফ করে দেয়। ফাইবারের স্লাইডিং জানালার বাইরে ততক্ষণে প্রায় সবকিছু সাদা! বাঁদিকের কোণায় সেই রডোডেনড্রন ঝোপটি অবশ্য এখনও পুরো সাদা হয়নি। মিতু সেটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই সারাদিনের ক্লান্তি এবং একটি দারুণ ডিনারের তৃপ্তিতে শরীর অবশ হয়ে ঘুম নেমে আসে।

ভোরের দিকে দিদুনের ত্রস্ত ডাকে ঘুম ভাঙে। বাইরের আবছা আলোয় মিতু দেখে সেই রডোডেন্ড্রনের ঝোপের কাছে একটি বড় ভালুকের মতন প্রাণীকে ধরে লাউঞ্জের দিকে নিয়ে আসছে ইলাদি আর দাদু। দুজন ওয়েটারও শব্দ পেয়ে ছুটে বেরিয়ে চেঁচাতে থাকে, ম্যাডাম, ম্যাডাম!

মিতু আর দিদুনও এবার দরজা ভেজিয়ে দ্রুত একতলার লাউঞ্জে নামে। সেখানে তখন থতমত হয়ে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছেন ফ্রন্ট অফিসে রাতের ডিউটিতে থাকা ভদ্রলোক। আর দাদু হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে হাসতে শুরু করে!

ইলাদি চাপা ধমক দিয়ে বলে, আঃ বাবা, থামো, তুমিই না বলো, কারও অসুস্থতা নিয়ে মজা করতে নেই!

দিদুন কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে, কে অসুস্থ? ইয়েতিটা কোথায়?

ইলাদি মুচকি হেসে বলে, ইয়েতি না মা, ইনিই সেই অদ্‌ভূত মানুষ! ঘুমের মধ্যে হাঁটেন! রোগটার নাম সোমনামবুলিজম বা প্যারাসোমনিয়া – ওর ঠিক কী হয়েছে তা ডাক্তাররাই বলতে পারবেন!

দিদুন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, এত বড় মাথা দেখলাম যে!

ইলাদি মুচকি হেসে ভালুকের মতো ফারের কোট পরা দীর্ঘদেহী লোকটার পেছন থেকে একটা বড় ফারের জিনিস হাতে নিয়ে বলে, এটা ওর মাথায় ঢোকানো ছিল!

দিদুন বলে, ওটা কী? এমন অদ্‌ভূত জিনিস মাথায় ঢুকিয়ে ঘুমায় কেন? পাগল নাকি?

ইলাদি মুচকি হেসে বলে, অস্ট্রিচ পিলো; এ হল এমন বালিশ, যার উপরে মাথা রাখতে হয় না, মাথা ঢুকিয়ে দিতে হয় বালিশের ভিতরে। তারপর যেখানে সেখানে মাথা ফেলে দিয়ে দিব্যি ঘুমনো যায়। নিশ্বাস নেওয়ার জন্যে রয়েছে এই ফুটোটা!

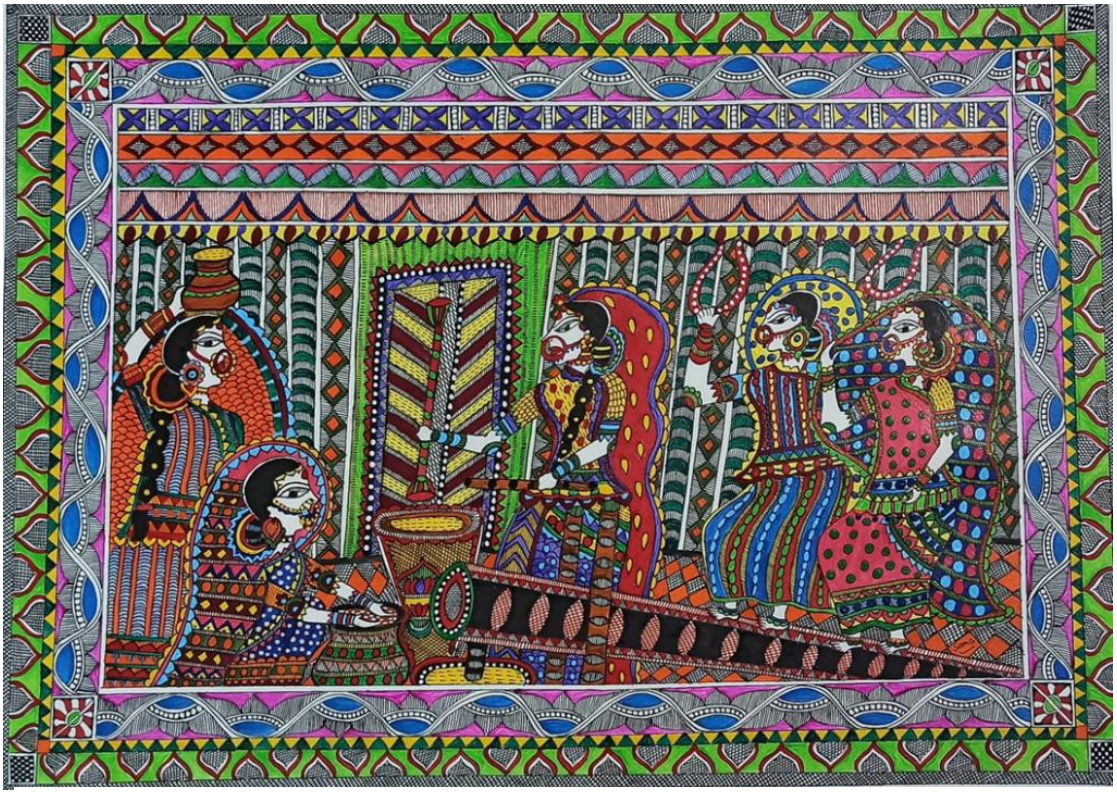

Women on the *Dheki* - *Maithili Painting by Ms. Soma Halder, Kolkata*

দীনুবাবু

সাগর বিশ্বাস

বাড়িটা দোতলা। নীচতলার একটা দশ বাই দশ ঘরের বাসিন্দা আমি। এ ঘরে চোখে পড়ার মতো যদি কিছু থাকে তা হল গাদা গাদা বই। একটা দেয়ালের পা থেকে মাথা পর্যন্ত বইয়ের পাহাড়। উল্টোদিকে আরো দুখানা প্রামাণ সাইজ আলমারি, বইয়ের ভারে টইটুম্বর। একটা টী টেবিল, সেটাও সারাক্ষণ বইপত্রের দখলে থাকে। তিন চারটে চেয়ার জুড়েও বইয়ের রাজত্ব। কেউ এলে চেয়ার থেকে বই নামিয়ে তাকে বসতে দিতে হয়। ঘরের তিনটে দিকেরই দখল নিয়েছে বই আর নানারকম পত্রপত্রিকা। এক কোণে স্তূপীকৃত বহুদিনের খবরের কাগজ। দেশভাগের সময় থেকে এ পর্যন্ত বেশ কিছু ঘটনার সাক্ষী তারা। তিন তিনট দেয়ালঘেঁসা এতসব সরঞ্জামের বাইরে এ ঘরে আর যা আছে তা হল চতুর্থ দেয়ালের গায়ে একটা তিন বাই সাতফুট মাপের তক্তপোষ এবং একটা ছোট রিডিং টেবিল। এই টেবিলটুকুই আমার লেখাপড়ার জায়গা। হাতলছাড়া চেয়ারটা টেবিলের তলায় ঢোকানো যায়। লেখা কিংবা পড়ার সময় চেয়ারটাকে টেনে বার করে বসি। খানিকক্ষণ বসার পর মাজা টনটন করলে তক্তপোষে একটু গড়িয়ে নিই, গড়াতে আমি ভালোই বাসি। সেটা কতটা আলসেমি আর কতটা বিলাস তা বলতে পারব না। তবে একবার গড়িয়ে পড়লে চট করে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। বিশেষত বয়সের এই পড়ন্ত বেলায়। মোদ্দাকথা, বাড়িতে থাকলে এই তক্তপোশখানাই আমার সবচেয়ে কাছের সঙ্গী। আমার রাতের আশ্রয়।

তবে সকাল দশটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত সে আমার দখলে থাকে না। তা পাঁচ-ছয় বছর হবে। এতগুলো বছর ধরে বেলা দশটা বাজলে একজন অশীতিপর মানুষ এসে সেখানে শুয়ে পড়েন। বয়সের ভার শরীরটা ন্যুব্জ, মধ্যপ্রদেশ স্ফীত, মাথার চুল কবেই মায়া কাটিয়েছে, কোমরে বাতজনিত কারণে বসে পাকতে পারেন না। তার উপর হাঁপানির কষ্ট আছে। তবে হাটার ক্ষমতা দ্রুত না হলেও, আছে। এখনও লাঠি ধরতে হয়নি। আর উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো আছে তাঁর চোখের জ্যোতি। এবং রসবোধ। দশটা থেকে একটা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাঙলা ইংরেজি যে দৈনিকগুলি আমি রাখি, তা পড়েন। বয়সের অবসাদে চোখ জড়িয়ে এলে কিছুক্ষণ ঝিমুনি দিয়ে আবার কাগজে মন দেন। এ বাড়ির গৃহকর্তৃকে ডাকেন 'আম্মা'। আম্মার চা এবং টুকটাক খাদ্যবস্তু রোজই কিছু না কিছু আসে। শুয়ে শুয়েই খেয়ে নেন। এভাবে ঘন্টাতিনেক কাটিয়ে একসময় উঠে দাঁড়ান। বই-পাহাড়ের এপাশ ওপাশ চোখ বুলিয়ে একটা-দুটো বই হাতে তুলে নেন। বাড়িতে পড়বেন। দরজার বাইরে গিয়ে পুরনো চটির মধ্যে পা ঢোকাতে ঢোকাতে বলবেন, আ: কেন যে আছি! এতলোক যায়, আমার শুধু পড়ে থাকা! বলতে বলতে হাঁটতে শুরু করেন। দুপুরের রোদ। হাতে ছাতাটা রয়েছে কিন্তু খোলার ইচ্ছে নেই। আমি হয়ত বারান্দা থেকে বললাম, ছাতাটা খুলে নিন। একটু হেসে উত্তর দিলেন, আর কী হবে!

দীনুবাবু। মানুষটা আমার অনেকদিনের চেনা। এ পাড়াতেই বাড়ি। গৃহপ্রবেশের দিন প্রতিবেশিদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেদিনই আলাপ। কলকাতায় একটি নামী স্কুলের শিক্ষক। স্ত্রীও শিক্ষকতা করেন। দুটিমাত্র সন্তান। ঠিকঠাক মানুষ করেছেন। বিয়ে দিয়েছেন সময়ে। মেয়ে থাকে দুর্গাপুর, জামাই ইঞ্জিনীয়ার। ছেলে আর

ছেলের বউ দুজনেই অধ্যাপক। সুখের সংসার। একজন স্কুলটিচারের এমন সাজানো ভরভরন্ত আলোকিত সংসার সমীহ করার মত। ওপারের বাস্তুহারা মানুষ যাঁরা এপারে এসে প্রতষ্ঠিত হয়েছেন দীনুবাবু তাঁদেরি একজন। মিশুকে স্বভাবের জন্য অল্পদিনের মধ্যেই আমি তাঁর আপনজন হয়ে গেলাম। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, মেট্রোপলিসের সুখসুবিধে ছেড়ে এই ধ্যাধধেড়ে গোবিন্দপুরে ডেরা বাঁধলেন কেন? উত্তরে মৃদু হেসে বললেন,
-ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ কীট, নেইকো ভালোবাসা, নেইকো স্নেহ।
-মফসসলে স্নেহ ভলোবাসার নদী বইছে বুঝি ?
-বইতেও পারে। সেই যে, যেখানে দেখিবে ছাই--ই। শরৎচন্দ্রের গ্রামের কথা মনে নেই বুঝি ?
-আছে সব আছে। তবে কিনা, সেদিন গিয়াছে শিয়রের কাছে কহিছে কালের ঘড়ি।

এমনই রসাল ছিল তাঁর আলাপচারিতার ধরন। চার আনা কথা, চার আনা হেয়ালি, চার আনা বক্রোক্তি আর চার আনা তাৎপর্য মিশিয়ে যে ককটেলটা ছাড়বেন তাতে প্রতিপক্ষের ট্যা ফু করা মুশকিল।

এখন বেলা এগারোটা। একটু আগে মানুষটার যৌবন বয়সের একটা বাঁধানো ছবির উপর একটা রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে এসেছি। 'কাজ'-এর বাড়িতে তখনো লোকসমাগম শুরু হয়নি। বাড়ির লোকেরা বারবার বলছিল মধ্যাহ্নভোজন করে যেতে। তাতে নাকি মৃতের আত্মার শান্তি হয়। আমি বিশ্বাস করি না। জীবনে যদি শান্তি না জোটে তবে মৃত্যুর পরে শান্তির মানে কী? কে দেখেছে সে শান্তির ছবি? কোন প্রমাণ আছে? সংসারে অনেক মানুষ থাকেন যাদের শেষ জীবনটা কাটে অনেক কষ্টে, অনেক না-পাওয়ার ব্যথায়। যে প্রত্যাশায় ঘর বাঁধা, সন্তান মানুষ করা, তা যখন মিথ্য হয়ে যায় তখনই দীর্ঘনিশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসে, আর কেন পড়ে থাকা! দীনুবাবুর ভরাট সংসার এককালে অনেকের কাছেই ঈর্ষণীয় মনে হত। বছর বাইশ আগে অবসর নেবার পর থেকেই আস্তে আস্তে জীবনের রসায়ন বদলাতে থাকে। স্ত্রীবিয়োগের পর একেবারেই একা হলেন। বিদূষী বৌমার সংসারে ক্রমশ অতিরিক্ত হয়ে ওঠা। মাঝে মাঝে মেয়ের কাছে যান। কিন্তু সেখানেও মন টেকে না। নিজের হাতে গড়া বাড়িটার জন্য এত মায়া, দিনান্তে তাঁর এক চিলতে ঘরের কোলে মাথা রাখতে না পারলে মনটা হুহু করে। দিনের বেলায় কাজে অকাজে এদিক ওদিক ঘুরলেও রাত্রে ওই বিছানাটুকুর টান বড় অমোঘ।

সেই তাঁর একান্ত আপন বিছানাটিও একদিন ছাড়তে হল। রোজকার মতো সকাল দশটা নাগাদ এসে বললেন, তোমার বাড়িতে দিনকতক থাকতে দেবে? মুহর্তে আমার ইন্দির ঠাকরুণের কথা মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে?
-বাড়িতে মিস্ত্রী লাগানো হবে, তাই বৌমা দিনকতক মেয়ের বাড়ি বা অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে বলছে। আমি বললাম, বেশ তো, মেয়ের কাছেই চলে যান।
-সেখানে তো ছিলাম। কয়েকদিন হল ফিরেছি। ওখানেও অসুবিধে খুব। দুটোমাত্র ঘর। ওদের ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে---
-হলই বা। অবস্থার গতিকে মানিয়ে নিতে হয়। তাছাড়া এ বাড়িতে ছেলে-বউমা তো আছে। মিস্ত্রী লাগিয়ে তারা থাকতে পারলে আপনি পারবেন না কেন?
-সে কথা বলেছিলাম। কিন্তু কে শোনে?
-কিন্তু আমার এখানে তো একটুও বাড়তি জায়গা নেই। তাছাড়া ব্যাপারটা ভালা দেখায় না। একই

পাড়ার মধ্যে ---
দীনুবাবু একটু বিমর্ষ হলেন। তাড়াতাড়ি উঠে দাড়িয়ে বললেন, ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়। চলি, পরে আসব।

পরদিন এসে বললেন, ও-পাড়ার কামালকে চেনো তো? ওদের ওখানে পেয়িং গেস্ট হিসেবে আছি। তোমার কাছে কিছু টাকা রেখে যাচ্ছি, দরকারমতো চেয়ে নেব। বলে এক বান্ডিল টাকা বের করলেন। পঞ্চাশ হাজার। আমি প্রমাদ গুণি। বলি, না না, এ হয় না। ব্যাঙ্কে রেখে দিন। --ব্যাঙ্কে রাখতে পারলে কি আর তোমাকে বলতাম?
বুঝলাম টাকাটা গোপন রাখতে চান। ব্যাঙ্কে দিলে তো আর গোপন থাকে না। বললাম, তাহলে নাতির অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দিন। সে তো এখানে থাকে না। কেউ জানতে পারবে না। আমার কাছে রাখলে জানাজানি হলে ছেলে-বউমা রুষ্ট হবে, অশান্তি বাড়বে। লোকেই বা কী বলবে?
বুড়ো মানুষটা একটু হতাশ হলেন। বললেন, ঠিক আছে। দেখি কী করি। তোমাকে বিশ্বাস করি তাই বলা। তবে তোমার যুক্তিটাও মানছি। আচ্ছা, আজ আর বসব না, পরে আসব।

কিন্তু সেই থেকে মানুষটা আর আসেন না। এপাড়া -ওপাড়ার দূরত্ব। একটা রিকশায় উঠলে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে চলে আসা যায়। তাও আসতে ইচ্ছে হয় না? পেয়িং গেস্ট হয়ে যেখানে আছেন সেখানে নিশ্চয়ই তাঁর সময় কাটানোর সুবিধেগুলো পেয়েছেন। কিংবা এমন হতে পারে, এত কাছে থেকেও রাতে তাঁর একান্ত আপন বিছানাটার স্পর্শ পান না, সেই দুঃখ থেকেও হয়তো এদিকে আসতে ইচ্ছে করে না। হতেই পারে। মানুষের মনের কোন গভীরে কী ব্যথা লুকিয়ে থাকে কেই বা তার হদিশ পায়। পাওয়ার চেষ্টাই বা কে করে? কেউ কারো মন বোঝে না। ভাবি, একদিন গিয়ে দেখা করে আসব। কিন্তু আজ-কাল করে। তাছাড়া লোকটার যা পাড়া বেড়ানো স্বভাব, হয়তো গিয়ে দেখব ঘরে নেই। গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে এলাকার যত খবর, ঘরে বসেই তার কাছ থেকে পেয়েছি। ঝড়ে কার পর ভেঙেছে, কোন বাড়ির বৃদ্ধ সকালে বেড়িয়ে আর বাড়ি ফেরেনি, চোদ্দ বছর সংসার করার পর কোন পরিবারের বউ পালিয়ে গেছে, কার ছেলে চারটে লেটার নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করল, কোন মেয়ের বিয়ে ভেঙে গেছে, কার বাড়িতে হিজড়েরা ঢুকে হাজার টাকা নিয়ে গেছে, এরকম খবর তার নখদ্রপণে। পাড়ার লোকেরা আড়ালে আবডালে বলে 'রুরাল গেজেট'।

মাসদুই পরে একদিন চাঁপার মা, আমাদের ঠিকে কাজের বউ, খবর দিল, দীনুবাবু নাকি হাসপাতালে ভর্তি। পড়ে গিয়ে হাড় ভেঙেছে। সেদিনই ভিজিটিং আওয়ারে দেখতে গেলাম। দিব্যি শুয়ে আছেন, শরীরে ব্যান্ডেজ, আমাকে দেকে একটু মুচকি হেসে বললেন, দুঃখহারি কথা শুনেছেন, আর কোথাও ছুটতে হবে না। আশ্চর্য, এর মধ্যেও রসিকতা আসে ? বললাম, কী করে হল ?

-- সে যদি জানতাম-বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।

--ফিমার বোন ভেঙেছেন, অনেকদিন শুয়ে থাকতে হবে।

--কী আর করা যাবে, আমার হাতে নেই ভুবনের ভার। তোমরা সব ভালো আছ তো? কথাটা কেমন যেন কাঁটার মতো গায়ে ফুটল। মনে মনে ভাবি, হ্যাঁ, আমরা তো ভালোই থাকি। আমাদের ঘর ছাড়তে হয় না, শয্যাসুখ ত্যাগ করতে হয় না, আমরা খারাপ থাকব কোন দুঃখে?

বাইরে এসে ছেলেকে বললাম, মফসসলের এই ছোট হাসপাতালে ঠিকঠাক চিকিৎসা হবে? নাকি কলকাতায় নিয়ে যাবে? সে বলল, বলেছিলাম, কিন্তু বাবা যেতে চায় না। এখানে ডাক্তার হালদার আছেন, বাবা তাকে খুব পছন্দ করে। পাশে একটি কমবয়সী মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, জানতে চাইলাম, এটি কে?

--ওর নাম ভাদু। বাংলাদেশের মেয়ে। বাবা যে কদিন বাড়িতে ছিল ওইই দেখাশুনা করেছে। এখনও ও-ই দুপুরে বাবাকে খাওয়াতে আসে। আজ খাবার খাইয়ে আর বাড়ি ফিরে যায়নি। ভিজিটিং আওয়ার শেষে একবারে আমার সঙ্গে যাবে।

পরদিন বাজার করতে গিয়ে হঠাৎ ভাদুর সাথে দেখা। তার হাতে অল্প কটা ঝিঙে। বললাম, তুমি বাজার করো নাকি? ভাদু একটু কাচুমাচু মুখে বল, না, আমার বাজার করতি হয়না। আজ এই ঝিঙে কয়ডা নিতি আইছি। কাল ম্যাশোমশায় আমার খাছে ঝিঙেপোস্ত খাতি চাইছেল, তাই। --তুমি অনেকদিন আছ এ বাড়িতে? --না না, এইতো একমাস হতি যাচ্ছে। দ্যাশ থিকা বাবায় নে আইছেল এই দ্যাশে আমার বে দেবে বলে। আমার বাপের লগে ক্যামনে জানি এই বাড়ির দাদাবাবুর আলাপ হইছে। অরা তহন বুড়া মানুষডার দ্যাহাশুনা করার জন্যি এটটা লোক চায়। বাপে আমারে দিয়া দ্যাশে গেছে। আইচ্ছা আমি যাই, রান্না নিয়া হাসপাতালে যাতি হবে। এর পরেও দুএকবার ভাদুর সাথে আমার যা দেখা হয়েছে তাতে জানতে পারি, চার ভাইবোনের মধ্যে ভাদুই একমাত্র মেয়ে । বড়দা বিয়ে করেছে। মা নেই। কিছুদিন ধরে একদল চ্যাংড়া ছেলে ওর পিছনে লেগেছে। এইসব উৎপাতের কারণে ওখানে মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া হয়। ভাদুকে বাঁচানোর জন্য ওর বাবা ওকে এপারে নিয়ে এসেছে। বিয়ের কথা বলা হলেও তেমন কোনো ব্যবস্থা হয়নি। দূর সম্পর্কের এক পিসির বাড়িতেই ওর থাকার কথা। হঠাৎ করে এখানে একটা সুযোগ পেয়ে ওর বাবা দেখল খাওয়া পরা ছাড়াও মেয়ে কিছু মাইনে পাবে। একরকম চাকরিই তো। পরে এসে যাহোক কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু তাই বলে অল্প পরিচিত নিছক দেশগাঁয়ের সুবাদে জানা কারুর ভরসায় একটা সোমত্ত মেয়েকে ছেড়ে যাওয়া? আচমকা খটকা লাগে। কিন্তু হতে কি পারে না? অনেকবছর আগে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় খুলনা থেকে আমাদের পরিচিত যামিনীবাবু তাঁর যুবতী মেয়েকে আমাদের কাছে রেখে গিয়েছিলেন। বিষয়টা আস্থা এবং বিশ্বাসের। বিপন্ন সময়ে মানুষ তো আশ্রয় খুঁজবেই। ভাদু এখানে খারাপ নেই। এই একমাসের মধ্যে সে দীনুবাবুর আপনজন হয়ে উঠেছে।

সুরসিক মানুষটির সেবা করতে করতে সে-ও মানুষটাকে ভালাবেসে ফেলেছে। দীনুবাবু তাকে বলেছেন, তুই আমার আর একটা মেয়ে। এই যে রোজ আমাকে খাইয়ে দিস, মনে হয় মায়ের মতো। তুই থাকলে আমি আরো অনেকদিন বাঁচব। আর সময় হলে আমি নিজেই তোর বিয়ের ব্যবস্থা করব। মানুষ কীভাবে কোথায় যে তার মূল্য ফিরে পায় তা সে নিজেও জানতে পারে না। ভাদু হাসপাতালে যায় মায়ের মমতা আর মেয়ের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে। সে প্রতিনিয়ত লোকটার আরোগ্য কামনা করে। তাঁর সেরে ওঠার সঙ্গে আজ যেন তারও ভবিষ্যৎ জড়িয়ে গেছে। ইতিমধ্যে এক লেখকবন্ধুর আশি বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাহিত্যসভায় যোগ দিতে দিনকয়েকের জন্য আমাকে বাংলাদেশ যেতে হল। ফিরে এসেই খবর নিতে গেলাম দীনুবাবুর

বাড়ি। ছেলে বেরিয়ে এসে বলল, বাবাকে যদি দেখতে যান তবে আজই যাবেন। তার অবস্থা ভালো নয়, আইসিইউ-তে আছে। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বললাম, সে কী? এইতো সেদিন বেশ ভালোই দেখে গেলাম। হঠাৎ কী এমন---হ্যাঁ, হঠাৎ-ই সোডিয়াম পটাসিয়াম ফল করে যায়। তাতেই ঘোর বিপত্তি, অন্যান্য সংকট তো ছিলই।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। বললাম, আমার তখনি মনে হয়েছিল পাড়াগাঁর হাসপাতালে---কী করব বলুন, বাবা কিছুতেই যেতে চাইল না। সবাই হয়তো আমাকেই দুষবে। কিন্তু আমার বাবার যে কী জেদ সে তো আমিই জানি। সংসারে এই জেদাজেদির মধ্যে পড়ে সারাজীবন আমি কেবল পুড়ে গেলাম। সেকথা কেউ জানবে না।

বিকেলে দেখতে যাব ভেবেও পা সরল না। কী দেখব গিয়ে? কীইবা শুনব? আইসিইউতে তিনি তো এখন যোগাযোগের বাইরে। অন্যরকম হলে হয়তো বলতাম, কী অ্যাদ্দিন ধরে হাসপাতালে শুয়ে আছেন! তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন। অমনি স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হয়তো পদ্য আওড়াতেন, তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি---ইত্যাদি। আমার পা সরল না তো সরলই না। পরদিন সকালেই জানতে পারলাম তিনি ভোররাত্রে চলে গেছেন।

এইমাত্র তাঁর যুবক-ছবির গলায় মালা পরিয়ে এসেছি। বেরনোর মুখে দেখি, বাইরে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে সেই সরল গ্রাম্য মেয়েটি। চোখের নীচে নোনাজলের শুকনো দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কাছে গিয়ে শুধু বলতে পারলাম, কেঁদনা ভাদু, কেউ চিরকাল বেচে থাকে না। সাবধানে থেকো, ভালো থেকো। সে শুধু কান্নাভেজা গলায় অস্ফুটে বলতে চাইল, অ্যাহন আমার কী হবে? আমি কনে যাব?

তাকে সান্তনা দেব এমন ভাষা ছিল না। কী হবে তা সে যেমন জানে না, আমিও জানি না। তার বাবা নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা করবে। ততদিন এরা হয়তো রেখে দেবে ওকে। তবু ভরসা জোগানোর জন্য বললাম, তেমন দরকার হলে আমার সাথে দেখা করো।

টেবিলের তলা থেকে চেয়ারটা টেনে বার করে শরীরটা এলিয়ে দিই। সামনেই আমার বিশ্রামের আশ্রয় তক্তপোষ। দুমাসের উপর হল এই সময়ে তার উপর আশ্রয় নিতে পারিনি। পাঁচ-ছয় বছর ধরে সময়টা ছিল দীনুবাবুর। বেলা দশটা থেকে একটা, এ তক্তপোষ আমার ছিল না। একটা বাজতে এখনও দুঘন্টা দেরি। এখনও সে দীনুবাবুর দখলে। কতদিনের কত কথা, কত সখ্য জড়িয়ে আছে তার।

আমি আজও সেখানে আমার দেহটাকে এলিয়ে দিতে পারলাম না।

*****

Code Name Silver

শুভব্রত মুখার্জী

১৯৪১, ২৬ জানুয়ারী:

পেশাওয়ারের কনকনে শীতের রাত । ছোটোখাটো চেহারার রহমত খানের সাথে দেখা হলো সেই বহুদূর কলকাতা থেকে আসা বছর পঁয়তাল্লিশের লোকটার। নাম জিয়াউদ্দিন খান । পেশায় ইন্সুরেন্স এজেন্ট । মাঝারি উচ্চতার সবল পুরুষ । মুখভর্তি লম্বা দাড়ি । রহমতের ওপর দায়িত্ব পড়েছে জিয়াউদ্দিন কে প্রায় দুশো মাইল দূরের শহর কাবুলে পৌঁছে দেওয়ার । কিন্তু যেতে হবে লুকিয়ে । দুর্গম পার্বত্য পথ । পথে বিভিন্ন উপজাতিদের উৎপাত । তারপরে আবার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সাথে আফগানিস্তানের সীমান্ত লুকিয়ে পেরিয়ে যাবার ঝক্কি । পাসপোর্টের বালাই নেই। সমস্যা কম নয়।

যাইহোক যাত্রা শুরু হলো। প্রচুর বাধা বিপত্তি কাটিয়ে অবশেষে পৌঁছনো গেলো কাবুল । রহমতের কাজ কিন্তু শেষ নয় । জিয়াউদ্দিন আসলে যাবেন মস্কো । সেই কলকাতা থেকে চাইলে সোজা পথে মস্কো যাওয়াই যেত। কিন্তু তিনি যাকে বলে একেবারে "His Majesty's Opponent "। চারদিকে শত্রু। তাই সোজা পথে যাবার উপায় নেই আসলে । রহমত তুখোড় লোক । জিয়াউদ্দিনের জন্য একটা জার্মান পাসপোর্ট জোগাড় করার জন্য দিনের পর দিন কাবুলের জার্মান দূতাবাসে ঘোরাঘুরি করলো। কিন্তু বিশেষ কিছু হলো না। শেষপর্যন্ত ইতালির রাষ্ট্রদূতের সাহায্যে একখানা ইতালিয়ান পাসপোর্ট জোগাড় হলো জিয়াউদ্দিনের জন্য। কিন্ত ভেক ধরতে হবে জিয়াউদ্দিনকে । তার নতুন নাম হবে Count Orlando Mazzotta । মস্কো পৌঁছলেন জিয়াউদ্দিন । কিন্তু যে কাজের জন্য এসেছিলেন সে কাজের কিছুই বিশেষ হলো না। ঠিক করলেন বার্লিন যাবেন। মস্কোর জার্মান রাষ্ট্রদূত বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করলেন বার্লিন যাবার জন্য। পৌঁছলেন বার্লিন । কাজ এগোলো অনেকটাই। অবশেষে ১৯৪২ এর মে মাসে দেখা করলেন এমন একজনের সাথে যার শুধু নামটাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভরা বাজারে ইউরোপের হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। Adolf Hitler । ইন্সুরেন্স এজেন্ট জিয়াউদ্দিন ওরফে কাউন্ট Orlando করমর্দন করলেন । পরিচয় দিলেন: সুভাষ চন্দ্র বোস !!

না। এ গল্পটা সুভাষ বোসের নয়। এটুকু শুধু ভূমিকার জন্য বলা । আসলে এটা রহমত খানের গল্প। সুভাষচন্দ্র তো মস্কো চলে গেলেন । রহমত রয়ে গেলেন। নজরে পড়লেন ইতালিও দূতাবাসের।

কাট টু ১৯৪২-৪৩ , দিল্লী :

জার্মানদের দেওয়া একটা ছোট্ট ট্রান্সমিটার থেকে নাগাড়ে খবর পাঠিয়ে চলেছে সেই রহমত। খবর দেওয়া হচ্ছে জার্মানদের। সব খবর নাকি ব্রিটিশ সামরিক শক্তির গোপন তথ্য । যুদ্ধের বাজারে জার্মানদের কাছে যার দাম অনেক। কিন্তু সব খবরই নেহাত গাঁজাখুরি। অপ্রয়োজনীয় কিছু সাধারণ তথ্যের সাথে নিখুঁত কল্পনার মিশেলে বানানো বিশ্বাসযোগ্য খবর যার জন্য জার্মানরা দিতে রাজি ছিল লক্ষ লক্ষ টাকা । কিন্তু মিথ্যে খবর দেওয়ার প্রয়োজন হলো কেন ? হলো কারণ রহমত তখন আসলে ব্রিটিশ গুপ্তচর । তার বড়কর্তার নাম Peter Fleming । ভারতে ঘাঁটি গেড়ে থাকা বিখ্যাত ইংরেজ গুপ্তচর । নামটা চেনা চেনা লাগছে কি ? Peter এর ভাইয়ের নাম Ian Fleming । প্রায় বছর দশ পরে প্রথম বই প্রকাশ থেকে তিনি শুরু করবেন এক নতুন ইতিহাস। বইয়ের নাম Casino Royale। প্রধান চরিত্রে স্পাই দাদার ছায়া।

মাত্র বছর দুয়েক আগে স্বয়ং সুভাষ বোস কে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া থেকে নিরাপদে আফগানিস্তানে

পৌঁছে দেওয়া রহমত খান হঠাৎ সেই ব্রিটিশের হয়েই কাজ করতে শুরু করলো কেন? পুরো গল্পটা মহাভারতের মতো লম্বা। খুব ছোট্ট ভাবে বলতে গেলে গল্পটা এরকম:

রহমত খান তার আসলে নাম নয়। আসল নাম ভগৎ রাম তলোয়ার । ছোটবেলাতেই বিপ্লবী সংগঠনে নাম লেখানো । তারপরে বামপন্থী ভাবধারায় দীক্ষা নেওয়া । পার্টির নির্দেশেই সুভাষ বোসের The Great Escape এ সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়া। সুভাষচন্দ্র মস্কো রওনা হবার পরেই কাবুলের ইতালিও দূতাবাসের সাথে যুক্ত হয়ে ইতালির হয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে চরবৃত্তির শুরু। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে সব ছেড়েছুড়ে আচমকা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার আগে যা যা করেছেন পড়লে বা শুনলে চমকে উঠতে হয়। কয়েকটা উদাহরণ : পাঁচটা দেশের চরবৃত্তি করেছেন । ইতালি, জার্মানি, জাপান, রাশিয়া আর ব্রিটিশদের হয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এরকম পাঁচটা দেশের হয়ে চরবৃত্তি করার কৃতিত্ব বিশ্ব ইতিহাসে আর নেই। দিনের পর দিন জার্মানদের বোকা বানিয়েছেন মিথ্যে খবর দিয়ে। যুদ্ধ শেষ হওয়া অব্দি কেউ কিস্‌সু বুঝতে পারেনি। উল্টে জার্মানরা তাকে দিয়েছে Iron Cross , নাৎসি জার্মানির "Highest Miitary Decoration"। খাইবার পাসের মধ্যে দিয়ে দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে ভারত থেকে আফগানিস্তান চষে বেড়িয়েছেন । ইতালিয়ান আর জার্মানদের থেকে রোজগার করেছেন লক্ষ লক্ষ টাকা। আজকের মূল্যে যা নাকি প্রায় ২.৫ মিলিয়ন পাউন্ড মানে প্রায় ২৫ কোটি টাকা।

স্বাধীনতার পরে বহুকাল খোঁজ পাওয়া যায়নি Silver এর। হ্যাঁ , এটাই ছিল পিটার ফ্লেমিং এর ভগৎ রাম কে দেওয়া Code Name। এই নামেই লুকিয়ে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের হয়ে কাজ করতো সে। কিন্তু স্বাধীনতার পরে হলো মহা মুশকিল । তার বিরুদ্ধে হাজার অভিযোগ । অদ্‌ভুত চরিত্র আসলে। প্রথম জীবনে বিপ্লবী সংগঠনের হয়ে কাজ করা ভগৎ, সুভাষ বসুকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা ভগৎ, শেষের দিকে কেন ব্রিটিশের হয়ে কাজ করেছিল সে উত্তর সঠিকভাবে আজও অজানা। বিভিন্ন তত্ত্ব আছে বটে কিন্তু সঠিক বেঠিক নিয়ে পাল্টা তত্ত্ব ও কম নয়।

দিনের শেষে ভগৎ বোধহয় শুধুই একজন গুপ্তচর ছিল । দেশ, Allied Power , Axis Power , সব সীমানা পেরিয়ে সে বোধহয় শুধু নিজের কাজের কাছেই দায়ী ছিল । নীতি নৈতিকতার মাপকাঠিতে বিচার হলে সসম্মানে অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভবনা বোধহয় প্রবল । কিন্তু এমন মানুষদের এই মাপকাঠিতে মাপা যায় কিনা তাই নিয়েই তো বিতর্ক হতে পারে। আমরা বরং খানিক্ষণের জন্য তাকে দেখি Spy Thriller এর রঙিন চশমায়। ভাবতে অসুবিধে কোথায় যে Peter Fleming দেশে ফিরে Silver এর কথা বলেছিলেন ভাই কে। হয়তো ভগৎ এরও ছায়া পড়েছিল Ian এর লেখায়। যে হয়তো কাবুলের ঘুপচি গলির আধো অন্ধকারে এক ইতালিও সেনা অফিসার কে বাড়িয়ে দিচ্ছে হাত । ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলছে "My name is Khan , Rahmat Khan " !!

(কৃতজ্ঞতা: Silver - The Spy Who Fooled the Nazis, By Mihir Bose)

*****

রেল লাইন

রাজর্ষি দাশগুপ্ত

আমার ছোটবেলায় একটা লম্বা সময় কেটেছে রামকৃষ্ণ মিশনের হোস্টেলে। পুরুলিয়াতে। Quarantine বা isolation এর অভিজ্ঞতাটা তখন প্রথম হয়েছিল। সদানন্দ ধামে। মানে আমাদের আবাসিক স্কুলের হাসপাতালে। ইটের রাস্তার শেষে একতলা ছোট-খাটো একটা বাড়ি, ঢুকে একদিকে ডাক্তার বাবুর বসার ঘর, অন্যদিকের ব্যাণ্ডেজ রুম। একটু এগিয়ে পুরুনো সেলফে সারি সারি হলুদ রঙের ফাইল, যাতে আমাদের মেডিকেল হিস্ট্রি লেখা থাকতো। সব ক্লাসের আলাদা আলাদা খোপ। বলাবাহুল্য মেডিকেল হিস্ট্রির বেশির ভাগটাই বানানো ছিল, কারণ আমাদের অসুখগুলো ছিল কাল্পনিক । কখনো ঘন্টা-ভাঙা রুটিনের ভয়ে, হোমওয়ার্ক হয় নি বা স্রেফ ভালো লাগছে না এই সব নানা কারণে আমরা অসুখের বাহানা করতাম। আর সাথে কিছুটা অভিনয়। হাসপাতালে সময় ছিল অফুরন্ত। ডাক্তারবাবু বেশ মজার মানুষ ছিলেন। তিনি সব বুঝতেন , শুধু বুঝতেন বললে ভুল হবে, ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করতেন। সকাল আটটা বাজলে সাইকেল চেপে আসতেন, সাথে একগাল দাড়ি আর মাথায় একটা টুপি। হাসতে হাসতে বলতেন আজ কি ছুটি দিয়ে দেব ? নাকি পেটে ব্যাথাটা এখনো আছে ? এই সবই ছিল রোজনামচা। আসলে হাঁপিয়ে যাওয়া রুটিন লাইফে একটু সময় চুরি করা- এইটে ছিলো মূল উদ্দেশ্য।

তবে মাঝে মাঝে সত্যিকরে অসুখ হতো। হাম বা চিকেনপক্সের মতো ভয়ানক অসুখ। সেই সময় ঠাঁই হতো হাসপাতালের একেবারে পেছনের দিকে isolation ওয়ার্ডে। সিনিয়র ওয়ার্ডের ঠিক পাশে চার বেডের এই ওয়ার্ডটা এমনিতে কিন্তু দারুন নস্ট্রালজিকে ছিল।ওয়ার্ডের বাইরে ছিল একটা ছোট বারান্দা। রেলিং ঘেরা। আর সেটা টপকালেই ছুটি। কারণ বারান্দার অদূরে ক্যাম্পাসের বাউন্ডারিওয়াল, সামনে কতগুলো লম্বা ইউক্যালিপ্টাস গাছ, তারপর রুক্ষ পাথুরের জমি। সেই রুক্ষ জমি মিশে গেছে দূরে রেল লাইনে। দূরত্ব অবশ্য বেশ খানিকটা। সেই লাইন দিয়ে ট্রেন আর মালগাড়ি চলতো, তবে সংখ্যা তেমন নয়। সকালের দিকে গুটি কতক মেইল এক্সপ্রেস, দুপুরে একটা দুটো প্যাসেঞ্জের । এই ট্রেনগুলোর মধ্যে কি জানি একটা দুঃখ দুঃখ ব্যাপার ছিল। হোস্টেল লাইফ মানিয়ে নিলেও আমরা সবাই অল্প-বিস্তর হোমসিক ছিলাম। আর ওই ট্রেন দেখলেই বাড়ি ফেরার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে চাগাড় দিয়ে উঠত। কখনো রাতের অন্ধকার চিরে চলে যাওয়া কামরার নিবু-নিবু হলদে আলো, ইস্পাতের পাতের সশব্ধ আন্দোলন যেন বুকের মাঝে নিশি ডাকার মতো ডেকে যেত ।আবার ঘুটঘুটে অন্ধকারে সেই প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতেই, নিশ্চুপ শূন্যতা গ্রাস করতো। তবু মাঝে মাঝে বারান্দায় চোখ রাখতে ভালো লাগতো। প্রচন্ড অন্ধকারের এক রুদ্ধশ্বাস সৌন্দর্য্য আছে। ভয় ও হতো। ভয় হওয়ার কারণ অবশ্য একটা প্রচলিত গপ্পো, এক ব্রহ্মচারী মহারাজকে নিয়ে। গল্পে তিনি এই ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলেন। হটাৎ খবর পান তার মায়ের অসুখের। বড়ো - মহারাজকে কাকুতি মিনতি করার পর ও ছুটি পান নি, কারণ সন্যাসীদের পূর্বাশ্রমে ফেরা বারণ। শেষে এই পাঁচিল পেরিয়ে কোন এক গভীর রাতে তিনি দৌড়াতে থাকেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। তার ছিন্ন ভিন্ন দেহ পাওয়া যায় পরের দিন রেল লাইনের উপর। ছাত্রমহলে কথিত ছিল তারপর সেই মহারাজকে অনেকে দেখছে বা দেখা গেছে - কখনো ভোররাতে মন্দিরের বাইরে আবার গভীর রাতে এই বারান্দায়। ভয়ের উদ্রেক করার জন্যে এই গল্পটি যথেষ্ট ছিল। যদিও পরে বুজেছিলাম এই

গল্পটা ও আমাদের অসুখের মতোই কাল্পনিক। শিশুমনে রেল লাইন ছিল একধরনের মুক্তির প্রতীক -- সে নিয়ে যায় কাঙ্খিত মাতৃক্রোড়ে, কিন্তু সে পথে পদেপদে বিপদ, এমন কি মৃত্যু ও। এইসব আসলে ছিল অলীক কল্পনা আর একধরণের সেলফ-ইম্পোসিশন। সাইকোলোজিতে এর নিশ্চয় বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

ছোঁয়াচে রোগের একটি গুণ অবশ্যি ছিল । কিছুদিনের মধ্যে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা হতো। তাই অবশেষে ছুটি মিলতো। রাতের কলকাতার ট্রেন সেই রেল লাইন ধরে ফিরতো কাঙ্খিত মুক্তির লক্ষ্যে। তবু তার চোখে থেকে যেত একটা ছোট বারান্দা , ঢালু জমি, ঘুটঘুটে অন্ধকার আর সেই রেল লাইন। মনে হতো অনেকেই তো ঘরে ফিরতে চেয়েছিলো, সবার আর ঘরে ফেরা হলো কই।

Introspection- *Painting by Poonam Mondal*

বিহারে ভ্রমণ

পার্থ প্রতিম ব্যানার্জী

৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ ই জুন, ২০১৮

বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধবার

পুরো এক সপ্তাহ, এক দিনের ডায়েরি লিখতে বসলাম ১৩ তারিখ। এর মধ্যে আমারা complete করে ফেললাম আস্ত একটা বার্ষিক ভ্রমণ। এখন লিখতে বসেছি তারই ভ্রমণ কাহিনী। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা বাচ্চাদের গরমের ছুটিতে family tour করে আসছি। শুরু হয়েছিল বড়কাছারি থেকে। AMIE পরীক্ষা য় পাশ করার পর একে একে বড়কাছারি, দক্ষিণেশ্বর-আদ্যাপীঠ-বেলুড়মঠ, তারকেশ্বর, তারাপীঠ-বক্রেশ্বর-শান্তিনিকেতন, পুরীতে যাই এবং ME পাশ করার পর উপরিউক্ত সবকটি জায়গা cover করার পর কাশী-বেনারস-সারনাথ-এলাহাবাদ-সীতামাড়ি সংযোজন করি। কিন্তু তীর্থস্থান ভ্রমণের এহেন লক্ষ্য যখন সমাহিত হল তখন আমারা এক এক করে অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ শুরু করি। যেমন APCর বন্ধুদের সাথে মুর্শিদাবাদ ঘুরে আসার পর গত বছর মায়ের ইচ্ছানুসারে দীঘার সমুদ্র সৈকতে পাড়ি দিই। তবে উক্ত গরমের ছুটিতে কোলকাতার চিড়িয়াখানা, টাকিতে বড় পিসির বাড়ীতে গিয়ে ইছামতি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দেখি আর ভাবি একবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ওপার বাংলাকে দেখে আসতে পারলে কেমন হয়! তাই কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিলাম না পরবর্তী family tourটা কোথায় করব - ভারতে দেশের মাটিতে না বিদেশে ! শেষমেশ ইচ্ছাপূরণের জন্য রাজগীর ভ্রমণটাকেই চুড়ান্ত নির্বাচিত করলাম এবং এর সাথে গয়া, বৌদ্ধ গয়া, নালন্দা, দেওঘর, পরেশনাথ যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। এতে সুবিধা হল কোলকাতার থেকে যাতায়াতের পথে ধানবাদে আমাদের বাসস্থান রয়েছে, তাই লম্বা journeyর ধকলটাকেও অনেকটা কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে।

এবার আসি টিকিট কাটার ব্যাপারে। হাতে সময় ছিল এতটাই অল্প আর office এর কাজের আর বাড়িতে ফুলঝুরিকে পড়ানো আর অন্যান্য কাজে এতটাই ব্যস্ত থাকতে হ'ল যে ট্রেনের টিকিট কাটতে শুরু করলাম প্রায় eleventh hours এ। ফলতঃ কিছু ক্ষেত্রে টিকিট choice মতো পাওয়া গেলনা, কিছু ক্ষেত্রে ট্রেনের টিকিট একদমই না পেয়ে গাড়িতে যাবার ব্যবস্থা করতে হ'ল। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে হাওড়া থেকে গয়ায় যাবার টিকিট না পেয়ে শিয়ালদা থেকে কাটতে হল, তাওবা তেমন উল্লেখযোগ্য ট্রেন পাওয়া গেলনা। শেষ পর্যন্ত শিয়ালদহ-আজমীর এক্সপ্রেসের টিকিট কেটে সন্তুষ্ট থাকতে হল। রাত ১০:৫৫ তে scheduled time. কিন্তু ট্রেন দেরীতে ছাড়লো প্রায় ১২:৩০ নাগাদ। সীট সবই একই coach এ (S-৫) পাওয়া গেল বটে, তবে কোনটাই Lower Birth এ নয়, সবই upper / middle / side upper বার্থে। সবথেকে চিন্তিত ছিলাম মা আর শিবানীর জন্য। কারন ওরা Lower Birth এ comfortable আর middle বা upper birth এ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে একেবারেই like করে না। তবুও manage হয়ে গেল। গয়ায় পৌঁছানোর scheduled time ছিল ৭ তারিখ সকাল ৬:৫৫ তে। কিন্তু ঘন্টা খানেক late এ ট্রেন গয়া স্টেশনে ঢুকলো এবং রাজগীর যাবার জন্য একটা Swift Desire ঠিক করলাম। Driver সুদর্শন। ওর সাথে ঠিক হল ও আমাদের গয়া থেকে সুদীর্ঘ ৬০ - ৬৩ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে রাজগীরের হোটেলে তুলে দেবে, সেখান থেকে নালন্দা, পাওয়াপুরি ইত্যাদি site seen দেখাবে, রাত্রে হোটেলেই থাকবে, পরের দিন সকালে গয়া নিয়ে যাবে, সেখান থেকে বৌদ্ধগয়া দেখিয়ে রাজগীর পৌঁছে দেবে। AC Car। Charge negotiation হল মোট ৬৫০০ টাকা।

যেহেতু আমরা গয়া-রাজগীর কোনো ট্রেন টিকিট book করিনি তাই এই গাড়ির ব্যবস্থা। এছাড়া রাজগীর থেকে ধানবাদে ফিরে সেখান থেকে দেওঘর আর পরেশনাথ যাবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ট্রেনের টিকিট না পেয়ে "Make my trip" থেকে বড় SUV গাড়ি online book করে রেখেছিলাম, যার price rate

রাজগীর থেকে ধানবাদ ৮৩৯৫ টাকা। বাধ্য হয়ে উক্ত amount ব্যয় করে AC SUV Toyota গাড়ি Innova book করেছিলাম। ঠিক ছিল ধানবাদ থেকে পরেশনাথ আর দেওঘর এক-এক দিন যাবার ব্যাপারে। কিন্তু ধানবাদো পৌঁছতে নির্ধারিত সময়ের তুলনায় দেরি হয়ে যাওয়ায় আমাদের পরেশনাথ যাবার পরিকল্পনাটি বাতিল করতে হল। আমরা কেবলমাত্র দেওঘর যাই এবং একটা Local Scorpio ভাড়া করে নিই।

এবার আসি থাকার ব্যাপারে। আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম কোলকাতার বেহালা বাড়ি থেকে। শিবানী আর বাচ্ছাদের (ফুলঝুরি আর সাইনা) আগেই রেখে এসেছিলাম কোলকাতায় গরমের ছুটিতে। আমি ৪(চার) তারিখ ধানবাদ থেকে রাতের ট্রেনে (শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস) রওনা হয়ে পরের দিন সকালে কোলকাতায় পৌঁছাই এবং সেখান থেকে আমি, বাপী, মা, শিবানী, ফুলঝুরি আর সাইনা রওনা দিই। ৭ তারিখ গয়া স্টেশনে নেমে গাড়ি book করে রাজগীরে পৌঁছাই ও হোটেল "নালন্দাতে" উঠি। ৭ তারিখ check-in ও ৯ তারিখ দুপুরে check-out, অর্থাৎ দুদিনের দু'টো ঘরের charge হ'ল মোট ১৫৩৫০ টাকা। ৯ তারিখ সন্ধ্যেবেলা রওনা হয়ে রাত্রে (রাত প্রায় ২ টো নাগাদ) ধানবাদে পৌঁছালাম। ১০ তারিখ ধানবাদে stay করে, ১১ তারিখ সকালে গেলাম দেওঘরে। সারাদিন বাবাধাম, তপোবন, ত্রিকুট পাহাড়ে গাড়ি করে ঘুরে অবশেষে রাত্রে back করলাম ধানবাদে। ১২ তারিখ বিকেলের Black Diamond Express এর AC Compartment এ কোলকাতায় পৌঁছালাম রাত্রে। হাওড়া স্টেশনে নেমে ট্যাক্সিতে বাড়ি পৌঁছে ১৩ তারিখ বেহালার বাড়িতে কাটিয়ে ১৪ তারিখ বিকেলের কোলফিল্ড এক্সপ্রেসে ধানবাদে প্রত্যাবর্তন করলাম। অর্থাৎ আমাদের সমগ্র journey তে ভাড়া করা থাকার জায়গা বলতে দুদিন দুরাত নালন্দা হোটেলে কাটানো ছাড়া বাকিটা বেহালা বাড়িতে journey র আগে ও পরে, ধানবাদ residence এ দেওঘর যাবার আগে ও পরে।

৬ তারিখ সারারাত শিয়ালদহ-আজমীর এক্সপ্রেসে journey করার পর ৭ তারিখ সকালে গয়ায় পৌঁছালাম। গয়া স্টেশনে নেমে বিভিন্ন গাড়ির ড্রাইভারের সাথে একে একে কথা বলে সুদর্শন নামে একটি ছেলের সাথে contract হল। ও আমাদের ওর একটি সাদা Swift Dezire গাড়িতে নিয়ে রাজগীর পাড়ি দিল। গরমকাল হলেও AC গাড়িতে ভ্রমন করায় গরমটা তেমন অনুভূত হলনা। সুদীর্ঘ ৬০-৬৩ km পথ। বিহারী রাস্তা হলেও এখন কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে রাস্তাঘাট অনেক সাবলীল হয়ে গেছে। তবে অল্প দু-একটি জায়গায় খানাখন্দ পেলেও অধিকাংশ রাস্তা ছিল সুন্দর, সুঠাম। পথে চলতে চলতে গাছপালা, মাঠঘাট, চাষের জমি ইত্যাদি উপভোগ করতে লাগলাম এবং সুদর্শনকে বলে রাখলাম সকাল থেকে কিছু পেটে পড়েনি, তাই উপযুক্ত জায়গা দেখে দাঁড়াতে, যাতে করে প্রাতঃরাশটা সেরে নিতে পারি। একটা জনবহুল জায়গায় এনে দাঁড় করালো। প্রাতঃরাশের order দিলাম। Plate এ খাদ্য পড়ার পর সম্বিত ফিরল, এটা তো বিহার, বিহারের জনপ্রিয় লিট্টি-চোখা। বিশেষ মুখে দিতে পারলাম না কেউই। পার্শ্ববর্তী একটি দোকান থেকে জিলিপি, চা, মিস্টি ইত্যাদি খেয়ে কোন ক্রমে পথচলতি প্রাতঃরাশ পর্ব সম্পন্ন করে আবার পাড়ি দিলাম রাজগীরের উদ্দেশ্যে। আবার single lane পিচের কালো রাস্তা আর দুপাশে সাদা border দেওয়া সুদীর্ঘ পথ বেয়ে আমাদের গাড়ি দুর্বার গতিতে এগিয়ে চললো। রাস্তার মাঝে মাঝে চোখে পড়ল স্থানীয় অধিবাসীদের দলে দলে সুসজ্জিত পোশাক-আসাক পরে auto, vano, ইত্যাদিতে সওয়ারী হয়ে রাজগীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা। সুদর্শন বলল রাজগীরে তখন বার্ষিক মেলা উৎসব চলছে, এটা খুবই জনপ্রিয়। তাই এসময় পুণ্যার্থীরা রাজগীর যায়। যাইহোক আমরা রাজগীর পৌঁছলাম এবং এক দেখাতেই choice করে ফেললাম হোটেল "নালন্দা"। সুসজ্জিত, সর্বসুবিধাযুক্ত হোটেলের দুটো AC room book করলাম। দামের ব্যাপারে চিন্তা করলাম না। সাধারণতঃ tour এ গেলে আমারা দ্রব্যমূল্যের ব্যাপারে তেমন মাথা ঘামাই না। সুদর্শনও দুপুর থেকে আমাদের ঘুরিয়ে দেখাবে, রাত্রে হোটেলেই থেকে যাবে পরের দিনের গয়া ও বৌদ্ধগয়া tour এর জন্য, এমনটাই ঠিক হল।

কোন ক্রমে আমারা মধ্যাহ্ন ভোজনটা সেরে নিলাম। একটু rest নিয়ে আমরা ready হয়ে নিলাম বিকেলের দিকে সুদর্শনের গাড়িতে স্থানীয় জায়গা ঘুরে দেখব বলে।

সুদর্শন আমাদের কিছুটা নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় ছেড়ে দিলো। বলল গাড়ি আর এগোনোর অনুমতি নেই। সেখানে ই দাঁড়িয়ে ছিল কিছু টাঙ্গা অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ি। বাচ্চারাও ঘোড়া দেখে বেশ উৎসাহিত হয়ে পড়ল। ঘোড়ার গাড়ি চড়ার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সবাই উৎসাহের সঙ্গে টাঙ্গায় চেপে বসলো। ঘোড়সওয়ার বেত দিয়ে অস্থিচর্মসার ঘোড়াটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলো এবং লাগাম টেনে দিক পরিবর্তন করতে লাগলো। নালন্দার ঐতিহাসিক ভগ্নপ্রায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ ধরে এগোনোর সময় বেশ ভয় ভয় করতে লাগলো, সরু পথ ধরে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে এগোনোর সময় যদি কোনও কারনে ঘোড়া বা চাকা পিছলে যায় তাহলে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যাবে। কিন্তু তেমন কিছুর সম্ভাবনা দেখা গেল না। ঘোড়াটি বাধ্য খোকার মতো মনিবের নির্দেশ অনুসারে এগিয়ে চললো। স্থানীয় লোকেদের আর্থিক অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে শোচনীয়, তাই ছেঁড়া জামা কাপড় পরিহিত, উন্মুক্ত পদ, শীর্নকায়, বুভুক্ষুর দল ভিক্ষা চাইতে চাইতে টাঙ্গার সাথে সাথে চলতে লাগলো। বুদ্ধদেবের মূর্তি এবং আরও কয়েকটি মূর্তিতে একটা প্রাচীন পাঠশালার অবয়ব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একটা গাছে অসংখ্য কাঠ-পিঁপড়ে। দূরে বিস্তির্ণ এলাকা জুড়ে দেখা যাচ্ছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপ, যেটা আমরা বহুবার ইতিহাসের পাতায় দেখেছি। মনের মধ্যে যেন বেশ একটা উত্তেজনা বহে গেল, আবছা ভাবে হিউয়েন সাং এর নামটাও যেন মনে পড়তে লাগলো। যাইহোক, এরপর যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরে এলাম। বাপী ঘোড়ার মালিককে বললেন, "ভাই ঘোড়াটাকে অত মেরো না, ওকে ভালো করে দানাপানি খেতে দেবে রোজ, তবে তো ও তোমাকে পয়সা এনে দেবে !" আমাদের জন্য সুদর্শন Dezire নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমরা চেপে বসলাম, AC চালু হল। এবার আমাদের নিয়ে চলল পাওয়াপুরী।

এটা একটা বড় Lake, ধার থেকে একটা parmanent পাথরের লম্বা jetty ঢুকে গেছে দীঘির একদম ভেতরে। সেখানে একটা মন্দির। আকর্ষণীয় পরিবেশ। জলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে, অসংখ্য। পাখিরা ওর রেণু কনা খাবার জন্য ভিড় করেছে। কেউ কেউ আবার খেয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে। অনেকটা পানকৌড়ি জাতীয় পাখি। জেটির ওপর অগনিত মানুষের পদচারণা। সকলেরই লক্ষ্য মূল মন্দিরে পৌঁছানো, যেটি প্রায় দীঘির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। মন্দিরের চারিদিকে শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধানো বারান্দা, স্তম্ভ শ্বেত পাথরের কারুকার্য খচিত। বহু পূর্ণার্থী বসে লেকের জলের শোভা উপভোগ করছেন। আমরাও বসে জিরিয়ে নিলাম, ফটো তুললাম। ভেতর থেকে ভেসে আসছে পুরোহিতের মন্ত্রচ্চারণ ধ্বনি। যাবার সময় জেটির ওপর দেখলাম বিশালাকার ফর্সা এক ব্যক্তি হাফ প্যান্ট পরে আরও কিছু লোক পরিবেষ্টিত হয়ে মন্দির দর্শন করে বেরিয়ে আসছেন। অনেককে বলতে শোনা গেল উনি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা। বুঝলাম কেন্দ্রীয় সরকারী আমলা। স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে কর্মজীবনের সবটাই যেন সঁপে দেন উক্ত মন্দিরর দেবতার চরণে। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় এসে সবাই আইসক্রিম খেলাম। উল্টো দিকে একটা নতুন মন্দিরের construction চলছে মনে হ'ল। এবার সুদর্শনের গাড়িতে রাজগীরের হোটেলে প্রত্যাবর্তন করলাম।

৮ তারিখ সকালে উঠে আমরা বৌদ্ধগয়া যাবো বলে ঠিক করলাম। সুদর্শন আমাদের ওর Swift Dezire গাড়িতে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে প্রথমে গয়া স্টেশনের কাছে, পরে ওখান থেকে গয়ার সেই বিখ্যাত মন্দিরে নিয়ে গেল, যেখানে বছর বছর লোকেরা আসেন তাঁদের পূর্বপুরুষদের পিণ্ডদানের জন্য। মন্দির প্রায় বন্ধ হবার সময় হয়ে এসেছে। আমরা তখনও খোলা পেলাম। মন্দিরের ভেতরে ঘুরে রৌদ্রের দাবদাহে আমরা আবার AC গাড়িতে এসে বসলাম। ও আমাদের নিয়ে চলল বৌদ্ধগয়ায়। বেলা বেড়ে যাওয়ায় বুদ্ধদেবের অনেক মন্দির / প্যাগোডা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাইরে থেকে অবশ্য অনেক

সুসজ্জিত বাগান, বুদ্ধদেবের বিশালাকার মূর্তি, পরিস্কার রাস্তাঘাট, দেশী-বিদেশী tourist দের আনাগোনা দেখলাম। একটা হোটেলে আমরা চানা-বাটুরা ইত্যাদি খেয়ে নিলাম। বাপীর জন্যও চিন্তা হচ্ছিল, সুদুর রাজগীরের হোটেলে একা আছেন। তাই বেশি সময়ের অপচয় না করে সুদর্শনের গাড়িতে back করলাম রাজগীরে। সুদর্শনকে ওর প্রাপ্য পাওনা মিটিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিলাম।

৯ তারিখ আমাদের তেমন কোথাও ঘুরতে যাওয়ার plan ছিল না। আগেই বলেছি train এর টিকিট না পেয়ে রাজগীর থেকে ধানবাদ ফেরার জন্য আমরা online এ MakeMyTrip এর six seater গাড়ি book করেছিলাম। গাড়ি আসার কথা ছিল দুপুর দুটোয় । কিন্তু driver কে phone করে বুঝতে পারলাম ও অন্য কোন trip সেরে আমাদের নিয়ে যাবে, তাই যানজটের excuse দিয়ে late এ আসার কথা জানালো। অবশেষে প্রায় ঘন্টা আড়াই-তিন Late করে গাড়ি রাজগীরের হোটেলে পৌঁছালো প্রায় বিকেল ৫টা নাগাদ। গাড়িটা Innova, specious হলেও গাড়ির গায়ে দূর-দূরান্তে ঘুরে বেড়ানোর ক্লান্তি ও ক্ষতচিহ্ন বর্তমান। গাড়ির পেছনের ডালাটা খুলে আমাদের যাবতীয় লট-বহর গাড়ির পেছন দিকটায় রেখে দিলাম। সঙ্গে যে হোটেল বয়রা সাহায্য করতে এসেছিল তাদের কিঞ্চিৎ বকশিশ দিয়ে আমরা রওনা হ'লাম। বিদায় রাজগীর, বিদায় হোটেল নালন্দা।

শহরের ঘিঞ্জি, জনবহুল ও ট্রাফিক সম্বলিত যানজট এড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে চললো। বনজঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ী রাস্তা, অসংখ্য turning, Truck দুর্ঘটনার এদিক ওদিক evidence। খাদের নিচের দিকে ঢলে পড়েছে বা ঝুঁকে রয়েছে। আমাদের driver টা খুব expert ছিল। আমাদের ঘুম এসে গেলেও ও অনবরত tobacco চিবিয়ে nurve কে strong রেখে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চলল।

আমাদের travel schedule এর পরের দিন অর্থাৎ ১০ তারিখের পরেশনাথ ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হ'ল। কারন আমরা যেটা ছক কষেছিলাম, ৯ তারিখ দুপুরে রাজগীর থেকে রওনা দেবো। রাত ৮ টা / ৯ টার মধ্যে ধানবাদে পৌঁছে যাবো। একরাত ধানবাদে কাটিয়ে পরের দিন সকালে পরেশনাথ রওনা দেবো। কিন্তু সব পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিল Make my trip এর road journey। ১১তারিখ আমরা সবাই সকালেই ready হয়ে গেলাম। নির্ধারিত সময়ে driver গাড়ি নিয়ে এলো। সবার ready হয়ে বেরোতে আরও ঘন্টাখানেক লেগে গেল। Driver আমাদের এর আগেও বহুবার ঘুরতে নিয়ে গিয়েছে। তাই বিকাশজীর কাছ থেকে ভাড়া করা গাড়ি আমাদের খুব familiar। নিকটবর্তী পেট্রোল পাম্প থেকে Diesel ভরে নিল। ধাইয়া, মেমকো মোড়, Bypass, ভুঁইফোড়, গোবিন্দপুরের রাস্তা ধরে NH এ পড়লো। তারপর একটু এগিয়ে NH এর ধার দিয়ে ঢুকে যাওয়া একটা রাস্তা ধরলো, যেটা নবনির্মিত রাস্তা। খুব সুন্দর ছবির মত রাস্তা, দূরে ছোট ছোট টিলা দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু-একটা স্থানীয় লোকেদের যাতায়াত বা tourist car দেখা যাচ্ছে। রাস্তাটি single lane এর এবং বেশ ফাঁকা ফাঁকা। আমরা এগিয়ে চললাম এবং আরও কিছুদূর এগিয়ে একটা জনবহুল রাস্তার সংযোগস্থলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চা পান করলাম। আবার গাড়ি এগিয়ে চললো এবং আরও কিছুটা এগিয়ে চলার পর High Way ছেড়ে পার্শ্ববর্তী একটি রাস্তা ধরলো। Driver জানালো এটাই দেউঘরের রাস্তা।

আমরা পৌঁছালাম একটি তুলনামূলক ভাবে ঘনবসতি ও হোটেল-রেস্টুরেন্ট সম্বলিত এলাকায়। আর এগোনো যাবেনা বলে driver জানালো। আমরা নেমে দেখলাম দেউঘরের শিবমন্দিরের রাস্তায় রিক্সা বা অটোরিকশা ছাড়া আর কিছু যেতে দিচ্ছে না। মা বললেন হেঁটেই যাবেন। মায়েরও হাঁটুর কিছুটা সমস্যা আছে। তবুও কোন কথা শুনলেন না, মনের জোরে হেঁটেই ঐ রাস্তা অতিক্রম করলেন, কারন রিক্সাওয়ালাকে অতিরিক্ত পয়সা দেবেন না। পৌঁছলাম মন্দিরের নিকটবর্তী রাস্তায়। পাণ্ডারা পিছু নিলেন। আমরা প্রণাম করবো, কিন্তু পূজো দেবার তেমন কোন লক্ষ্য ছিল না। তাই পাণ্ডারা বুঝে সরে গেল, তেমন উৎসাহ দেখালো না। এবার পার্শ্ববর্তী প্যাড়ার দোকান থেকে ডাকতে লাগল। আর এগোনো

যাবেনা বলে driver জানালো। ও একটা side করে park করালো। আমরা নেমে দেখলাম দেউঘরের শিবমন্দিরের রাস্তায় রিক্সা বা অটোরিকশা ছাড়া আর কিছু যেতে দিচ্ছে না। মা বললেন হেঁটেই যাবেন। মায়েরও হাঁটুর কিছুটা সমস্যা আছে। তবুও কোন কথা শুনলেন না, মনের জোরে হেঁটেই ঐ রাস্তা অতিক্রম করলেন, কারন রিক্সাওয়ালাকে অতিরিক্ত পয়সা দেবেন না।

পৌঁছলাম মন্দিরের নিকটবর্তী রাস্তায়। পাণ্ডারা পিছু নিলেন। আমরা প্রণাম করবো, কিন্তু পূজো দেবার তেমন কোন লক্ষ্য ছিল না। তাই পাণ্ডারা বুঝে সরে গেল, তেমন উৎসাহ দেখালো না। এবার পার্শ্ববর্তী প্যাড়ার দোকান থেকে ডাকতে লাগল। জুতো খুলে রেখে মন্দিরে যেতে পারি। আমরা একটা প্যাড়ার দোকানে ঢুকে জল-ফুল ইত্যাদি নিয়ে খালি পায়ে মন্দিরে ঢুকলাম। মূল মন্দিরে ঢোকার বিশাল লাইন। বাইরে জল ঢেলে দিলেই চলবে বলে জানালেন স্থানীয় পুরোহিতরা। পাশেই দূর্গা মন্দির। ঢুকে দর্শন করলাম। একই জায়গায় বেশ কয়েকটি মন্দির ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আমরা কয়েকটি মন্দির চত্বরে প্রদক্ষিণ করে বেরিয়ে এলাম। প্যাড়ার দোকান থেকে প্যাড়াও কিনলাম নিজেরা খাবার জন্য ও অপরকে দেবার জন্য।

এবারে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য একটা হোটেলে ঢুকলাম। তেমন ভালো হোটেল বা রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ল না। কোন রকমে একটা অনামী ছোট হোটেলে পেটপুরে মধ্যাহ্ন ভোজন সারলাম আমরা সকলে। এরপর একটা Auto Rickshaw ধরে আমরা সকলে একটা রাস্তার সংযোগস্থলে যেখানে আমাদের Scorpio টাকে ছেড়েছিলাম সেখানে meet করলাম এবং গাড়িতে উঠে পরবর্তী স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

আমাদের পরবর্তী destination ছিল তপোবন এবং চিত্রকুট পর্বত। এসবই রামায়নে পড়েছিলাম। তাই মনে হ'ল এই সমস্ত স্থান পবিত্র এবং ভ্রমণের উপযুক্ত। Driver জানালো শ্রাবণ মাসে শিবের উৎসবে ও গাজনে চৈত্র মাসে সমস্ত রাস্তা লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে এবং দর্শনার্থীদের দীর্ঘ লাইন পড়ে।

ও আমাদের আঁকা বাঁকা অনেক গলি রাস্তা পেরিয়ে একটা ফাঁকা রাস্তায় এনে ফেললো এবং বেশ কিছুটা সোজা চলতে লাগলো। বেশ কিছুটা চলার পর একটা ছোট টিলার কাছাকাছি একটা ফাঁকা ফাঁকা জায়গায় এনে ফেললো। ওখানে প্রবেশের জন্য আছে প্রবেশ মূল্য। গাড়ি রাখার জন্য Parking Charges। বললো এটা হ'ল তপোবন। বেশ কিছু ভ্রমণার্থী দর্শনের জন্য উক্ত এলাকায় সমবেত হয়েছেন।

একটা পাহাড়। পাহাড়ে উঠতে পারবেন না বলে বাপী-মা নিচেই গাড়িতে বসলেন। আমি, শিবানী, ফুলঝুরি আর সাইনা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলাম। চারিদিকে হনুমানের উপদ্রব। তারা নানান দর্শনার্থীদের রাস্তা আটকে তাদের হাত থেকে কোন কিছু খাদ্য পাওয়া যায় কিনা তার অনুসন্ধান চালাচ্ছে। কোথা থেকে একজন guide এসে আমাদের এ অঞ্চলের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বোঝাতে থাকলেন। আমাদের পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে নিয়ে চললেন। হনুমান আসলে পাশ থেকে কিছু কিনে দিতে বারন করলেন, কিন্তু হনুমানগুলো এমন ভাবে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে কাছে এসে তাদের অভীপ্সা প্রকাশ করতে লাগলো যে ভয়ে পড়ে একটা দুটোকে এভাবে মোকাবিলা করতে হ'ল। বিশেষতঃ, বাচ্ছাগুলোর জন্য ভয় লাগছিল, যদি নিরাশ হয়ে কামড় বসিয়ে দেয়। এরপর পাহাড়ের একটা খাঁজ দিয়ে নিয়ে যাবার কথা বললেন ভাড়া করা guide। পাহাড়ের ওপর দু-একটা মন্দিরও দেখালেন। আমি পারলেও শিবানী বা বাচ্চারা উক্ত পথে ভ্রমণ অভিযানে যে সক্ষম হবে না সেটা বেশ বুঝলাম। তাই ফিরে এলাম। Guide কে কিছু পারিশ্রমিক (৫০ টাকা) দিয়ে গাড়িতে ফিরলাম, নলকূপের জল নিলাম, সব কিছুই chargeable। মা বললেন উনিও নাকি পাহাড়ের কাছ থেকে একবার ঘুরে এসেছেন।

তপোবন ভ্রমণ সম্পূর্ণ করে আমরা গাড়ি নিয়ে এগোলাম চিত্রকূট পর্বতের দিকে। বিশাল পর্বত ও অসংখ্য হনুমানের লম্ফঝম্ফ। রাস্তার ওপরেই চরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য হনুমান।

এমনকি car parking এর কাছেও ওরা চলে আসছে ও আস্ফালন করছে। আমরা দু-একটা selfy ও হনুমানের ছবি তুললাম। ভয়ে পড়ে কেউই চিত্রকূট পাহাড় দেখার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করলো না। দূর থেকে দেখলাম সুবিস্তৃত চিত্রকূট পর্বত। বেশ কিছুটা উঁচু। রোপওয়ের ব্যবস্থা আছে। অসংখ্য হনুমান।

যাইহোক, এরপর আমারা ধানবাদ অভিমুখে রওনার দিলাম। আবার সেই ফিরতি রাস্তা ধরলাম। আবার সেই ফিরতি রাস্তা ধরলাম। গোধূলি লগ্নে সূর্য দেবতা প্রান্ত রেখায় ঢলে পড়েছেন। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে। সূর্যের লাল আভা সমস্ত আকাশকে ঘিরে ফেলেছে। গাড়ি Highway ধরে এগিয়ে চললো। Head Light জ্বালালো। ধীরে ধীরে অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে। গাড়ি সাবলীল গতিতে এগিয়ে চললো। বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে wiper এর গতি কখনো বাড়ালো, কখনো কমালো। আমরা আবার সেই চায়ের দোকানের নিকটবর্তী সংযোগস্থলে পৌঁছলাম এবং রাস্তার একধারে গাড়ি park করিয়ে দোকান থেকে চা, সিঙ্গাড়া, জিলিপি ইত্যাদি কিনে খেলাম। তারপর আবার NH , গোবিন্দপুর, মেমকো মোড়, ধাইয়া হয়ে City Centre এ আমাদের আবাসনে পৌঁছালো। এইভাবে আমাদের দেওঘর tour সম্পূর্ণ হ'ল।

১২ তারিখ সকাল থেকেই গোছগাছ শুরু হয়ে গেল। রাজগীর-দেওঘর-নালন্দা-গয়া ভ্রমণ করে এবার কোলকাতায় ফেরার পালা। আমাদের যাত্রা কোলকাতা থেকে শুরু হলেও আমরা ধানবাদ Flat এ থেকে ভ্রমণের কিয়দংশ সেখান থেকেই schedule করেছিলাম। কিন্তু যাত্রা পথের finishing point রেখেছিলাম সেই কোলকাতার খিদিরপুর।

তাইজন্য সকালে মুখ ধুয়ে, দাড়ি কামিয়ে, স্নান-আহ্নিক করে, খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা ধানবাদ স্টেশন থেকে Black Diamond Express এ চড়ার জন্য দুপুরে বেরিয়ে পড়লাম আমি, বাপী, মা, শিবানী, ফুলঝুরি আর সাইনা। Black Diamond এর AC Chair Car কম্পার্টমেন্টে আমরা কোলকাতার হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। রাত্রে পৌঁছে Pre-paid Taxi Booth থেকে Taxi book করে খিদিরপুরের Flat এ পৌঁছালাম। মা চটজলদি কিছু খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেললেন। এইভাবে আমরা ১২ তারিখ সকালে ধানবাদ ও রাত্রে কোলকাতায় কাটালাম। ২৭৫ কিলোমিটারের ব্যবধানে এই দুটি শহরে আমরা প্রায়শই দিনের অর্ধেক অর্ধেক সময় বসবাস করার সুযোগ পেয়ে যাই, যখন এক শহর থেকে অন্য শহরে পাড়ি দিই।

১৩ তারিখ বাপী-মাকে খিদিরপুরের বাড়িতে রেখে আমি, শিবানী, ফুলঝুরি আর সাইনা বিকেলের Coal Field Express এ ধানবাদ রওনা দিই এবং ধানবাদ এসে আমরা আমাদের Tour programme complete করি। আমাদের অনিশ্চয়তায় ভরা এই ভ্রমণ সম্পূর্ণ হ'ল। আগেই বলেছি আমাদের এই spot selection ছিল একদম অকস্মাৎ এবং নানান options থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাছাই করা। তবে সার্বিকভাবে এই ভ্রমণ ছিল সময়োপযোগী এবং বিভিন্নতায় ভরা। গ্রীষ্মের দাবদাহে সচরাচর অনেকেই এই স্থান নির্বাচনে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু আমাদের কাছে এই সময়ের মূল্য অনেক, তাই গ্রীষ্মের ছুটির এই কয়েকটা দিন সম্পুর্ণ ভাবে ব্যবহার করার সুনিপুণ প্রচেষ্টা বরাবরই আমাকে সাফল্যের মুখ দেখিয়েছে। এইভাবে শেষ হল আমাদের বিহার-ঝাড়খণ্ডের মধ্যস্থিত ঐতিহাসিক স্থান রাজগীর-নালন্দা-পাওয়াপুরী, দেওঘর, গয়া, বৌদ্ধগয়া ভ্রমণের সাতদিনের সূচী।

জয় বাবা সিদ্ধিদাতা গণেশ, জয় তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর জয়, জয় হিন্দ!!

হঠাৎ খুশি

অনিন্দিতা দত্ত

হঠাৎ খুশির হাওয়া বয়ে নিয়ে এল আমার নিজ ভূম সূদুর দেশ থেকে আসা একটি বাক্স, এটি যেন আমায় শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। মনে পড়ে গেল ছোট বেলায় মা বাবার সাথে বোনকে নিয়ে পুজোর আগে নতুন জামা কাপড় কেনার কথা।
তখন ট্রেন্ড বা ফ্যাশন অত বুঝতাম না। যেটা ভালো লাগত আর সামর্থ্যের মধ্যে হতো বাবা সেটা কিনে দিতেন।
শুধু জামা নয় সাথে হতো এক জোড়া জুতো ও। মনে পড়ে তখন বছরে হয়তো দুই বা তিন বার ই নতুন জামা কেনা হতো, পুজোতে নববর্ষে আর হয়তো জন্মদিনে। তখন ছিল না এই মল কালচার, গড়িয়াহাটের সারি সারি দোকানের একটা থেকে বা হয়তো নিউ মার্কেট এর কোনো দোকান থেকে কেনা হতো।
আর বেরোনো মানেই বাইরের রোল ফুচকা বা চাউমিন খাওয়া।
আজ ১৪ বছর হলো কলকাতার বাইরে, গত দুবছর হলো দেশের বাইরে। কখনো ভাবিনি দুর্গা পুজো কোলকাতার বাইরে কাটাব। চাকরি জীবন শুরু করার পর থেকে দুর্গা পুজো মানেই বাড়ি ফেরার, প্রিয়জনের সাথে দেখা করা গপ্পো করা আনন্দ করা এক সাথে খাওয়া।
নতুন জামা পরে ভীড় প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখা, আলোর খেলা দেখা আর কোলকাতার ঘ্রাণ নেওয়া।
বিগত দুবছরে পুজো মানে যে বাড়ি ফেরা সেটা লুপ্তপ্রায়। পুজো হয়ে উঠলো একদিনের উৎসব, একদিনেই গান, বাজনা, আড্ডা, খাওয়া দাওয়া সব। আর প্রিয়জনদের বহু মাইল দূর থেকে ভিডিও কলে ধরা।
এই বিষাদের মধ্যেই হঠাৎ খুশির একটা ঘটনা ছোটবেলার সাথে মিল ঘটিয়ে দেয়। ইন্ডিয়ান পোষ্টের মাধ্যমে যখন বহু মাইল দূরে বাড়ির থেকে পাঠানো একটা বাক্স আসে আর তার মধ্যে পাঠানো নতুন জামা কাপড় থাকে, থাকে আরও অনেক কিছু, থাকে হয়তো এক টুকরো কোলকাতা, হয়তো বা বাড়ির গন্ধ, মা বাবার বিষাদ মেশানো মুখের হাসি।
ঠিক তখনই সেই ছোটবেলায় মা বাবার হাত ধরে গড়িয়াহাটের দোকান থেকে নতুন জামা কেনার আনন্দের সাথে এই বাক্স তে পাঠানো নতুন জামা একখানি বাড়ির অঙ্গ হয়ে যায়। হঠাৎ এই খুশি পেয়ে মনে হয় যেনো বাড়ির থেকে দূরে থেকেও বাড়ির অনেক কাছে চলে গেলাম।
হঠাৎ এই খুশি ছোটবেলায় দুতিন বার জামা কেনার মতো আনন্দ দেয়।
হঠাৎ এই খুশি সব দূরত্ব ভুলিয়ে দিয়ে শুধু খুশির রেশ বুলিয়ে যায় মনে।

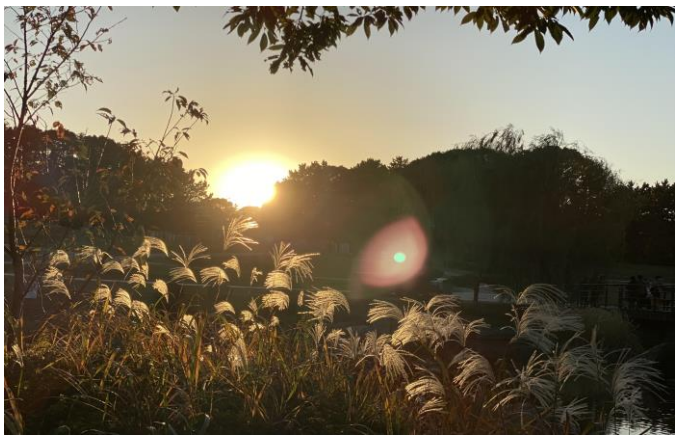

"**একধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা**" - *Photography by Nitin Srivastava*

দুলুদা

~ সুশান্ত ভট্টাচার্য্য

আমাদের পাশের বাড়িটাই - দুলুদার। ভদ্রলোক রিটায়ার্ড প্রফেসার। বয়স - প্রায় তিয়াত্তর হবে।

বছর তিনেক হ'ল দুলুদার বউ-ছেলে তাঁর সঙ্গ ছেড়ে অন্যত্র থাকেন। অনেককাল আগে থেকেই দুলুদার মাথার চুলগুলোও তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে শুরু করেছে। বয়সের ভারে স্বল্পকেশী দুলুদার গাল তুবড়ে পাকা চৌসা আমের মত হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত কোনো ডাক্তারবাবুই তাঁকে এক্সরে করতে বলেননি! উনি জামা খুললেই ডাক্তারবাবুরা যা বোঝার বুঝে যান।

সরল, সাদাসিধে, ব্যয়কুণ্ঠ, স্বল্পাহারী, স্বল্প-বসন দুলুদা সারাটা দিন ছোট পাতলা একটা গামছা পরেই দিনাতিপাত করেন। বাড়িতে কোনো অতিথি এলেও এর অন্যথা হয় না। দুলুদার সঙ্গে গামছার যেন এক অদ্‌ভুত আত্মিক সম্পর্ক!

আজ সকালে দেখি - আমাদের সেই দুলুদা বাড়ির দরজা-জানলা যাকে দিয়ে রঙ করাচ্ছেন সেই মিস্ত্রিকে দিয়েই ঝুল বারান্দায় খালি গায়ে গামছা পরে বসে মাথায় কলপ করাচ্ছেন।

"এ স্বাদের ভাগ হবে না" বললে তো আর চলে না! তাই এমন একটা উপভোগ্য দৃশ্য দেখতে পেয়ে - "তাড়াতাড়ি দেখবে এস" বলে গিন্নিকে একটু জোরেই ডেকে ফেললাম। দুলুদা উঠে গেলেন। রঙের মিস্ত্রীকে বললেন - 'ভেতরে চল'।

এই প্রথমবার দুলুদাকে একটু হলেও লজ্জা পেতে দেখলাম!

Dance- *Painting by Syna Kothari*

শরৎ

সুব্রত সেনগুপ্ত

শরৎ মানে কাশের ছোয়ায় দূর্গা মায়ের বোধন
শরৎ মানে আকাশ জুড়ে আনন্দ উদযাপন
শরৎ মানে সব বাঙালী একটি বৃন্তে ফোটা
শরৎ মানে মন গহনে ঢাকের বাদ্যি ওঠা
শরৎ মানে মন খারাপের জবরদস্তি ছুটি
শরৎ মানে সুখ আর খুশির অবাধ্য খুনসুটি
শরৎ মানে অসুর নিধন দশভুজার হাতে
শরৎ মানে বীরেন ভদ্র মহালয়ার প্রাতে
শরৎ মানে পুজো সংখ্যা নতুন কেনা কাটা
শরৎ মানে নতুন জুতোয় ঠাকুর দেখার হাটা
শরৎ মানে শুদ্ধ হওয়া অষ্টমী অঞ্জলিতে
শরৎ মানে পং ক্তি ভোজে ভোগের প্রসাদ পাতে
শরৎ মানে ভাষান শেষে আলিঙ্গনে মাখা
শরৎ মানে আসছে বছর আবার হবে দেখা।

ইচ্ছেডানা

সুব্রত সেনগুপ্ত

জীবন তোকে আগুন দিলাম, মন প্রদীপে রাখিস
ফাগুন তোকে শিশির দিলাম, সর্ব অঙ্গে মাখিস ।
আকাশ তোকে দিলাম আলো, বিলিয়ে দিতে তারায়,
পাখি তোকে অসীম দিলাম, ছিটিয়ে রাখিস ডানায় ।
ভাবনা তোকে আবির দিলাম, রঙিন মনে থাকিস
মনন তোকে কৃষ্টি দিলাম, সৃষ্টি সুখে ভাসিস ।
স্বপন তোকে সবটা দিলাম, আগুন থেকে কৃষ্টি
মেঘ ভেঙে তুই নামিয়ে আনিস/ টাপুর টুপুর বৃষ্টি ।

পুজোর খুশি

শ্রীপর্ণা রায় চৌধুরী

পুজো মানে,
শিশিরস্নাতা ঘাসের ডগায় আঙ্গুল ছোঁয়া,
পুজো মানে,
সুনীল আকাশ পেঁজা মেঘের ঈষৎ ধোঁয়া।
পুজো মানে,
সদ্য ফোঁটা শিউলি রাশির সুবাস-আতর,
পুজো মানে,
রেল লাইনের গা-জড়ানো কাশের চাদর।
পুজো মানে,
কুমোরটুলির সদ্য মাখা গন্ধ মাটির,
পুজো মানে,
শুনতে পাওয়া বোল উঠেছে ঢাকে কাঠির।
পুজো মানে,
নতুন জামায় সেজে ওঠা কয়েকটা দিন,
পুজো মানে,
হৃদয়পুরে আনন্দ তোলে খুশির বিন।
পুজো মানে,
"ডায়েট" ভুলে সাজিয়ে তোলা ভোজের থালা,
পুজো মানে,
হপ্তাখানেক ভালো-মন্দয় বাঁচার পালা।

তাই শারদীয়া এলো ফিরে,
আগমনীর সুরে সুরে
দেখো আনন্দময়ী মেয়ে এসেছেন
বছর ঘুরে মায়ের দ্বারে ।।

"মেঘবালক"

শ্রীপর্ণা রায় চৌধুরী

আজকে আমি নীরবতায় লিন,
আজকে আমার কবিতা লেখার দিন।
আজকের রাত ভীষণ এলোমেলো,
আজকে পথ সাবধানে পেরোলো।
পেরিয়ে গিয়েও আবার জলে ঝাঁপ,
শব্দ জুড়ে পুন্য,শব্দ জুড়ে পাপ।
আজকে তারারা ছন্দ মেলায় খুব,
দূরে গিয়েও কবিতায় দায়ে ডুব।
কিংবা তারারা আকাশে উড়তে চায়ে,
ডানায় রোদ পিছলে পড়ে যায়।
উষ্ণতায় জড়িয়ে থাকা পালক,
একা একা অচেনা মেঘবালক।
মেঘ বলছে যাবো যাবো আজ,
শব্দ তাই খুলতে থাকে ভাঁজ।
ভাঁজের ভিতর লুকিয়ে রাখা আদর,
শব্দ ছুঁয়ে রাত,শব্দ ছুঁয়ে ভোর।
নীরব কোথায়?এইতো কথা বলে,
স্নান করছে শব্দ নদীর জলে।
স্নানের ফাঁকে ছিটিয়ে দিলো জল,
এমনি এমনি ভেবোনা কোনো ছল।
আজকে এখন ভিজবে আমার সাথে,
শুধু দুজনে হাত রেখে দুই হাতে।
ডুবে ডুবে দেব দুজনে ডুব সাঁতার,
পৌঁছে যাবো অন্য কোনো পার।
পারে উঠে খেলবো কানামাছি,
চোখ বাঁধলেও পাশাপাশি আছি।
ফুলের দেশের দুজন প্রজাপতি,
ভুলে যাওয়া লাভ কিংবা ক্ষতি।
হিসেবে না হয় রইলো পড়ে বাকি,
শব্দ বরং একসঙ্গে থাকি।
এবার থামি ইতি টানা হোক,
আজ ভালোবাসি শুধু তোমায় মেঘবালক।।

তুমি শেষ কবে চিৎকার করেছিলে|

প্রত্যূষা সরকার

ইদানিং তুমি সন্ধে দিতে ভুলে যাও
সাড়ে পাঁচটার রেডিওটা হেঁচকি তোলে দেয়ালে
তারপর দেয়াল থেকে কাঁটাতার
তোমার চোখ ফেঁটে অন্য কোনও শব্দ
তোমার কানের মেশিনে একশো দশমিক এক মেগাহার্টজ
তুমি ভুল করে ধূপ জ্বালিয়ে দাও রান্নাঘরে
ঠাম্মি, তুমি শেষ কবে চিৎকার করেছিলে?

নদীর ওপর তিনটে গুলি
পদ্মা থেকে গঙ্গা তুলসী পুজো হয়নি শেষ
নদীর নাম ভারতবর্ষ
তোমার চোখে বাংলাদেশ
অবিরাম রক্ত ফুটছে তোমার সিঁথিপথে
দাদান আর এদেশে ফেরেনি!
ঠাম্মি, তুমি শেষ কবে চিৎকার করেছিলে?

আমি তোমার চোখে আকাশ দেখি রোজ
চশমা দাগে সাদা আবির
মায়ের সাথে ঝগড়া মানেই
"অই দ্যাশে আমাগো কত্ত জমি ছেলো
তর দাদাশ্বশুর মস্ত বড় জমিদার..."
কথা আর শেষ হয় না
আমি ফিকফিক করে হাসি
ঠাম্মি, তুমি শেষ কবে চিৎকার করেছিলে?

বাবা তখন বছর খানেক হবে
পিসির সবে দেড় মাস
তোমরা পালিয়ে আসোনি, আমি জানি
নিজের মাকে ছেড়ে কেউ পালিয়ে আসে না!
দুটো দেশ উদযাপন করছিলো উদ্বাস্তু চিৎকার।
দাদানের অফিস ছিল কলকাতায়
তুমি এসেছিলে কবে বলো তো?
"অই তো, তোর পিসি যেবার কোলে আইলো।"

পাঁচ মাস পর ওদেশ থেকে চিঠি
দলিলপত্রে সই সাবত, শুধু তো এটুকুই
দাদান ভোর-রাতে বেরিয়েছিল
ফেরার দিন বাবা নাকি বারবার প্লেন দেখছিলো জানলা ধরে?
আর তুমি বলছিলে,
"অত রোদে তাকাসনি, তর বাপে নৌকেয় আসবো"

নদীর ওপর তিনটে গুলি
পদ্মা থেকে গঙ্গা তুলসী পুজো হয়নি শেষ
নদীর নাম ভারতবর্ষ
তোমার চোখে বাংলাদেশ
ঠাম্মি, তুমি শেষ কবে চিৎকার করেছিলে?

বাবা কেমন করে কেঁদেছিলো জানো?
কাঁদলে বাবাকে কেমন লাগে?

গত রাতে ফোন এসেছে
জাফরাবাদ থেকে কলকাতা।
কাঁটাতারটা অদৃশ্য
কুয়াশা বেড়েছে দিল্লিতে
বাবার চোখে মৃত নদী
পিসির ছবির সামনে টিমটিমে প্রদীপ
বাজারে সব ফুল শেষ
তোমার সিঁথির পর কোল পোড়ালো দেশ
তুমি একবারও চিৎকার করবে না?

ঠাম্মি, তুমি শেষ কবে ভারতবর্ষকে সৎ মা বলে জেনেছিলে?

নবদুর্গা

কেয়া ভট্টাচার্য্য

ছোটবেলার শারদীয়া
দেখেছি মা কে, চারটি রাত
আজ দেখলাম, সেই মা কে
নতুন ক'রে, আটটি হাত!
সাথের সাথী সন্তান তার
পায়ে অসুর মরণভীত
এখন দেখি একলা যে মা
কোথায় মহিষ পরাজিত।
সেদিনের ঐ আগমনী
আনতো বয়ে ছুটির যে সুর
আজকে আকাশ আলোয় ভরা
নতুন খুশি, সুধা ভরপুর।
পুজো তাহলে কাকে বলে?
কার নাম হয় আরাধনা?
মাতৃমূর্তি কেমন হবে?
কয়দিন বা তার সাধনা?
আমরা যাকে বেঁধে ফেলি
৪, ৫ বা ৯টি রাতে
অসীম যে সে, অরূপ সে যে
৪,৮ বা ১০টি হাতে।

Shiva and Shakti - *Painting by Soumi Roy*

Goddess of Good Fortune- *Painting by Bipasha Dutta, Tokyo*

"আমার সোনার হরিণ চাই "- *Painting by Samayeeta Basu, Chinsurah*

Off we go- *Painting by Anika Debnath, Tokyo*

A walk by the Kamogawa- *Painting by Ritaja Dasgupta, Kyoto*

Painting by Ananya Kothari, IISJ,Tokyo

Painting by Manya Kothari, IISJ, Tokyo

तुम अपराजिता

खुशी वर्मा

धार हो तुम नदी की
पत्थरों में बना ही लोगी
रास्ता अपना
कली तुम कोमल गुलाबी
मुस्कुरा कर सीखा है तुमने
काँटों में खिलना
सूर्य की रश्मि हो तुम
चीर कर साम्राज्य तम का
जानती हो चमकना

हो पथिक तुम
वक़्त दे रहा चुनौती
पर कहाँ कैसा ठहरना
रास्ते ना हों कठिन तो
मंज़िलों की क्या तमन्ना

अपराजिता तुम
जीत तेरी है सुनिश्चित
बस चलते रहना चलते रहना।

अगली छुट्टी

नितिन श्रीवास्तव

2019 की उस शाम रिक्शे वाले ने जब आख़िरी मोड़ लिया था,
मोहल्ले की तंग गलियों को पीछे छोड़ दिया था।
शायद, बचपन के घर ने गंभीर आवाज़ लगाई थी,
लोहे के गेट ने भी करुण पुकार सुनाई थी।
हमने ही कुछ अनसुना कर दिया था,
उस लम्हे को हल्का रख दिया था।
सोचा था अगली छुट्टी में फिर से पहचान कर लेंगे,
वो जो छूट गया है उसका अनुसंधान कर लेंगे।

अब निरंतर यादों का सिलसिला चलता है,
देशांतर करने को मन, ना जाने कितनी उड़ानें भरता है।
बातचीत दो ही आयाम में अब समाई है,
छूने की कोशिश में केवल शून्यता हाथ आयी है।
हमने ही पुराने अनुभवों को दरकिनार कर दिया था,
वो जो संबंधों को ताक़ पर रख दिया था।
सोचा है अगली छुट्टी में फिर से एहसास कर लेंगे,
वो जो दूर स्थापित है, सदैव के लिए पास कर लेंगे।

Recipe Corner

Chocolate cake *by Anindita Datta*

The not so perfect looking cake yet the droolworthy cake that would make your dear and near ones asking for more.

Go ahead and make it on special days or just as a snack on ordinary days.

You thought you would need an oven, no, only a microwave will do the job.

Things that you would need other than the ingredients.

1. A big bowl to mix everything.
2. Microwave safe glass or porcelain baking tray (I used a round bowl).
3. Parchment paper
4. A brush to grease the baking tray

Ingredients:

1. All-purpose flour- 1 cup
2. Sugar- 1 cup (I used powdered brown sugar and you can always adjust as per your taste. You may use a grinder to grind the sugar if it's not powdered)
3. Cocoa- Little less than ½ cup
4. Baking powder- ½ tablespoon
5. Baking soda- a pinch
6. Eggs: 3 (Kept at room temperature)
7. Oil- ½ cup (I used canola oil, you may use any vegetable oil)
8. Vanilla essence- 1 teaspoon
9. Butter-to grease (at room temperature)
10. Dry fruits (optional)

Method:

1. First, grease a baking tray with butter, line it with a parchment paper, and keep it aside.
2. Take a clean and dry bowl and first sieve the all-purpose flour so that there are no lumps.
3. Add the sugar and give it a mix.
4. Sieve the cocoa powder, baking powder and baking soda together and give it a mix.
5. Add the eggs, oil and vanilla essence, mix everything, and ensure that there are no lumps.
6. Feel free to add raisins, cashew nuts, walnuts or almonds although these are optional, and I did not use any.
7. Transfer this batter to the baking tray. You may also divide the batter into two baking trays and place it in microwave separately.
8. Place it in a microwave.
9. Set the power to High. I used 700 watts as that's the highest for the microwave I use and first bake for 4 mins. After 4 mins check with a toothpick if the consistency is right. If required switch on the microwave for another 30-60 secs and check again. Once done, don't take it out, keep it inside for 5-10 mins, and let it set and then take it out.

Go ahead, slice the cake, and eat it as it is. However, if you would like to do a little bit more then you may follow the next steps.

10 years of IBCAJ

Soumya Dutta, Tokyo

The one organization of all ... IBCAJ.

Being at the heart of the most robotic city of all , lies an organization of pure hearted, passionate individuals who crave not only for the glory of the mighty Durga but also the humility of following the path bestowed upon us by our ancestors which is to take our culture forward.

It is not an organization that belongs to any individual but the lust for becoming that almighty keeps driving people away from the common values of respect and brotherhood. Yes it is the love the brotherhood the humility that survives. Nothing but the heart ... nothing but the heart is the cry but heart is just an organ on fire most often than not and far far away from the brain where there is calmness, there is intelligence. 10 years of IBCAJ is an ode to several minds who showed calmness of spirit, unfathomable intelligence to make it where we are now.

The nasty era had been witnessed by time with cautious eyes as the air echoes saying history repeats itself. However, what is darkness without a promise of another grand tale of victory by light.

Never be afraid to stand for the right; never forget to foster the brotherhoods the sisterhoods, o IBCAJans. Remember plurality, empathy, is our strength.

Never surrender never diminish never ever lose your charisma o IBCAJ, you beauty. Remember that for you even the unwanted, the vagabonds, the homeless like us have a home away from home.

About us

The journey so far

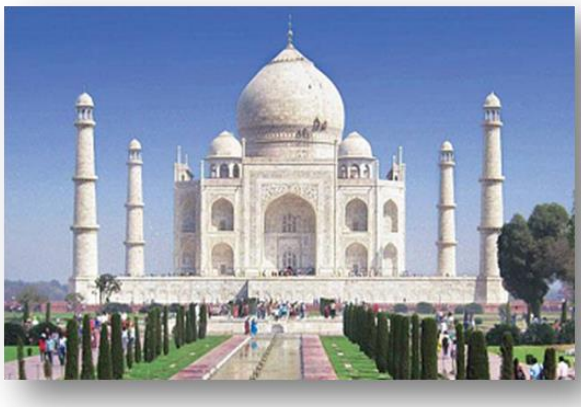

Our Organisation was formed in 2007 to bring the Bengalis living in Japan together with the desire of imparting a feeling of 'Home away from Home'. The name was "Kolkata Cultural Society, Japan". However, more than being Bengalis we are Indians so we broadened our reach to the Indian Diaspora living in Tokyo and renamed our Association to "India Bengal (Cultural) Association, Japan" in 2014. One of the founder members is Mr. Motoyuki Negishi, whose father was close aide to Netaji Subhas Chandra Bose. At present our organisation consists of around 30 families as members comprising of people from various corners of India. Apart from these there are many other Indian, Bangladeshi and Japanese families who actively participate in all our programs despite not being registered members.

Cultural endeavors

The cultural heritage of India is well known world over and Bengal is known to be the cultural capital of India. Being in Tokyo, far away from our motherland, we felt that it is essential and our prime duty to promote our rich culture lest so that we and our future generations never forget it. We have been organising Cultural Programs round the year by combining them with festivals and events like Durga

Puja, Saraswati Puja, Holi, Rabindra Jayanti, New Year and Independence Day celebrations. The Durga Puja and Saraswati Puja organised by us is one of the most popular events in the area and is visited by people in huge numbers. Most of the performances in these cultural programs are designed, composed and performed by the members of our organisation. Special

emphasis is given to kids' performances to groom them for the future and to inculcate the Indian culture in them.

Cultural exchange

National - We indulge in Cultural Exchange Programs with other Indian Associations in Tokyo by inviting them to perform in our programs and participating in programs organised by them.

International - To foster cross-cultural exchange between India and Japan we have been hosting Japanese troupes/performers to regularly perform in our programs.

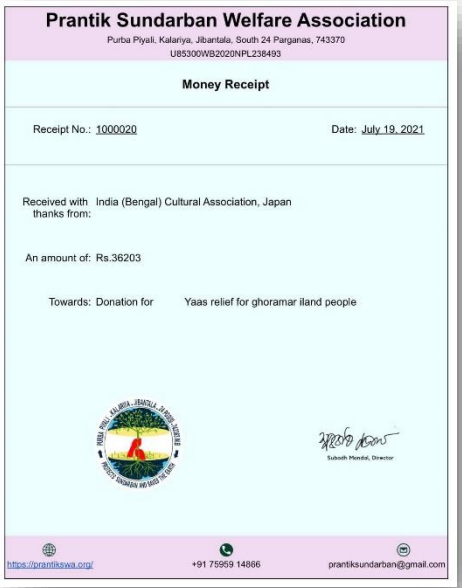

Prantik Sundarban Welfare Association

Purba Piyali, Kalariya, Jibantala, South 24 Parganas, 743370

U85300WB2020NPL238493

Money Receipt

Receipt No.: 1000020 Date: July 19, 2021

Received with thanks from: India (Bengal) Cultural Association, Japan

An amount of: Rs.36203

Towards: Donation for Yaas relief for ghoramar iland people

Subodh Mandal, Director

https://prantikswa.org/ +91 75959 14866 prantiksundarban@gmail.com

Contribution to social causes

During natural calamities, such as the massive earthquake, which struck Nepal in April 2015, we offer assistance to the distressed people by

donating Blankets, Clothes, Dry Foods, Tents etc. We also cooperate with the Japan Vedanta Society with financial support. We are currently in process of reaching out to other Japanese NGOs to collaborate in social welfare here in Japan within our limited capabilities.

Leisure, food and sports

Apart from cultural and social activities, we often indulge in outdoor camps with friends and family. Birthdays are celebrated cumulatively at the end of each month. Well, our enjoyment is not only limited to that. IBCAJ has its cricket team, called “Bengal Samurai”. We often set foot on the playground on weekend mornings for practice.

IBCAJ introduced a new event recently, “Ilish Utshab” to relish one of the most famous Bengali cuisine... Ilish (the Bengaki name for Hilsa fish). After all, its not just another association, it’s a family, and we call it “IBCAJ”. If you too would like to be a member of this family, please feel free to drop an e-mail or message to one of the addresses given at the back of this magazine.

Current members of India (Bengal) Cultural Association

Mr Amlan Debnath

Ms Anindita Datta
(Jt. Secretary)

Mr Anish Dey

Mr Bidesh Mondal

Dr Bhaskar DasGupta

Mr Bhaskar Deb

Mr Dipankar Biswas

Ms Jayeesha Ghosh

Mr Kalaswan Datta
(Coordinator, Cultural Committee)

Mr Kaushik Paul
(Coordinator Outdoor Events)

Dr Kaustav Bhattacharyya

Mr Kumar Sankar Roy

Mr Mrinmoy Das

Mr Naba Kumar Ghosh
(President)

Dr Nabarun Roy

Mr Naba Gopal Roy

Mr Pallab Sarkar
(Coordinator, Media wing)

Dr Pradipta Mukherjee

Mr Punit Tyagi

Dr Rajarshi DasGupta
(Magazine Coordinator)

Dr Rajib Shaw

Dr Ruma Mondal

Mr Samriddha Sengupta

Mr Sanjib Chatterjee
(Treasurer)

Mr Sanjib Sanyal

Mr Soumya Dutta
(Vice-President)

Mr Soumyadeep Mukherjee

Ms Somdatta Banerjee

Mr Srinesh Kundu

Mr Subhasis Pramanik
(Jt. Secretary)

Mr Subrata Pal

Dr Suchandra Banerjee

Mr Sugam Ghosh

Dr Sukanya Mishra

Mr Swapan Kumar Biswas
(Advisor to the working committee)

Message from Ex-members

Sudipto Saha

"The festival of Durga Puja is so special to Bengalee.It is not only about worshipping the Goddess but a lot more, involving new clothes, delicious foods, banter and fun, meeting new people, rejoicing with friends, hopping from pandals to pandals and what not. In a single word, it's *"Joy Unlimited"*. That is why we wait so eagerly for the event the whole year-round.
In Tokyo, IBCAJ has been creating the same atmosphere year on year with relentless efforts and immaculate arrangements. The enthusiasm and dedication with which the event is arranged both devotionally and culturally creates an environment of home away from home and is worth participating in. As an ex-member of IBCAJ, I still feel privileged to be a part of it when we were in Tokyo."
I congratulate IBCAJ for their effort and hope that the show will continue with the same fervor in the future.

We had been members of IBCAJ for more than 3 years. It was an amazing experience with fond and vivid memories!! While we will give it a miss this year, we wish IBCAJ all the best in its tenth anniversary of Durga Puja celebration. It's a great milestone indeed and looking forward to many such milestones in years to come.

Subhabrata Mukherjee

Sayantan Roy Chowdhury

দূর্গাপুজো !!! তাও আবার টোকিওতে, ভাবা যায় না!! দূর্গাপুজো মানেই জমিয়ে আড্ডা, খাওয়াদাওয়া, নতুন জামা, গানবাজনা। দিল্লীতেই ঠিক করে এরকম মজা পাওয়া যায় না , সেখানে টোকিওতে নাকি দারুন দূর্গাপুজো হয়!! এরকম ভাবনাচিন্তা করতে করতে যখন ২০১৬-র ফেব্রুয়ারী মাসের প্রচন্ড ঠান্ডায় টোকিওতে পা দিলাম, তখন বুঝতেই পারিনি যে সমস্ত আনন্দের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে IBCAJ নামের একটি organization এ। যারা একেবারে ভুলিয়ে দেয় কলকাতা থেকে দূরে থাকার যন্ত্রনা বরং দেয় একদম পাড়ার পুজোর "পুজো -পুজো " গন্ধ আর জমিয়ে আড্ডা দেওয়ার সুযোগ। কৃত্রিমতার সমস্ত ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে IBCAJ -এর সেই দূর্গাপুজো এবার পা দেবে দশ বছরে। এখনও ভুলতে পারিনা সেই একদিন পুজোতে চারদিনের মজা নেয়ার চেষ্টা, আন্তরিকতা আর সাবেকিয়ানায় ভরা দূর্দান্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো আর সাথে খাওয়াদাওয়া আর আড্ডা। আন্তরিক অভিনন্দন IBCAJ কে দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আর সকল সদস্যদের জানাই দূর্গাপূজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন।

DURGA PUJA 2020

Statement of Collection & Expenses

Income	Amount (JPY)	Expenditures	Amount (JPY)
Visitors/members contribution+ donation	584,400	Food expense	281,100
Advertisement	253,000	Pujo Hall Rental and Infra expense	225,322
		Idol Charges (including logistics)	669,784
		COVID protection expenses	17,367
		Cultural event expense	134,119
		Miscellaneous	57,688
Total Income	**837,400**	**Total Expense**	**1,385,380**

SARTAJ®

THE HOUSE OF QUALITY PRODUCT

All Indian Spices, Juices, Snacks, Cosmetics and other Indian grocery products are available at Sartaj.

株式会社サルタージ　SARTAJ CO. LTD

Importer & Distributor of Indian spices and goods.

世界から品質の高いスパイスや食材を輸入し、販売しております。

〒563-0043 OSAKA-FU,IKEDA-SHI,KODA 2-10-23

株式会社サルタージ大阪府池田市神田2丁目10-23

☎072-751-1975　✉info@sartajfoods.jp

📠072-751-1976　🌐www.sartajfoods.jp

OUR BRANDS

Mother's RECIPE, MDH, Real Fruit Power, INDIA GATE BASMATI RICE, BRITANNIA, Kitchens of INDIA, Dabur, KHADI NATURAL, Vadilal Quick Treat, Mo'pleez, Himalaya SINCE 1930, Dabur Herb'l Toothpaste, Haldiram's NAGPUR TASTE OF TRADITION, DENVER, eat light, think bright SHANTA, SARTAJ THE HOUSE OF QUALITY PRODUCT, Dabur Vatika PREMIUM NATURALS, DermoViva, BVitas, लिज्जत पापड, SWAD Distinctly Different..., AASHIRVAAD

✉ info@sartajfoods.jp　☎ 072-751-1975　📠 072-751-1976　🌐 www.sartajfoods.jp

〒563-0043 OSAKA-FU,IKEDA -SHI,KODA 2-10-23　株式会社サルタージ大阪府池田市神田2丁目10-23

ASHIAN GROECERY SHOP

BEST QUALITY & CHEAP PRICE

Home Style Foods

GHORER SHAD
ゴレル シャッド
TEL:03-6801-7687 Mob:090-9155-2656

CATERING SERVICE
PARTY , EVENTS

¥2000 CASH RECEIVE OFFER!!!

- BECOME SBI MEMBER,
- DO 1st REMITTANCE,
- REFER SOMEONE &
- EARN 2000 yen

SBI Remit
03-6801-7687, 070-8425-7821

SALE SALE SALE

INDIA GATE (5 KG) BASMATI RICE ¥ 2199 (Including Tax)
JAPANESE RICE(10 KG) ¥ 2299 (Including Tax)
WHOLE CHICKEN (4 P/700G) ¥ 1000 (Including Tax)
INDIAN MASOOR DAL(5KG) ¥ 1000 (Including Tax)
CHICKEN SAUSAGE(4P) ¥ 1000 (Including Tax)
PARATHA (4PACK) ¥ 1000 (Including Tax)
SALAD OIL (5KG) ¥ 1180 (Including Tax)

GHORER SHAD

Call us: 080-4937-1012
Tokyo, Edogawa-ku, Hirai 2-25-15

RI
RIJIK INTERNATIONAL

ADY wishes the IBCAJ members & guests a warm and safe Durga Puja in 2021!
スパイスバル レストランADY-アディ
ADY - Fusion restaurant, Indian food using Indian spices & Japanese condiments!
Events : Please contact us for -- birthday, anniversary and graduation parties PLUS other events such as Independence day or Holi or 1st Baishakh or Diwali celebrations!
We have 80 seats and we can offer a competitive budget!
P.S. we have karaoke and sing your favorite song; Plus we have speaker system to make announcements and to listen to your favorite tunes.
ADY
03.6457.9833 / +81-3-6457-9833
ady.shinbashi@gmail.com
www.ady.mobi
Follow us
Instagram: ady_gram
https://www.facebook.com/ADY488
Use Coupon for a FREE Drink or ¥500 DISCOUNT
IBCAJ 21 ADY
Address :
Tokyo, Minato City, Shinbashi, 1 Chome-15-5 Persa Bldg. 5F
東京都港区新橋 1 の15の5 ペルサ115 5階

intersoft
Think IT Simple
Wish IBCAJ Members & Guest a Happy & Safe Durga Puja!
sales.japan@intersoftkk.com
linkedin.com/company/intersoft-kk/
https://www.instagram.com/intersoftkk/
+81. (0)90.9314.6346
https://intersoftkk.com/
https://www.facebook.com/intersoftkk.pvt.ltd
We help implement your business idea and Grow...
Digital Marketing : Google Ad, FB Ad, SEOs, Line, WhatsApp, Instagram, Pinterest and more
E-commerce Solution: Retail, Restaurant, Grocery Food Delivery Apps & E-learning Platfrom
Embedded & IoT: Infotainment & Sensor Management Platform with Data Analytics
Fintech Solution Software: Online Banking, Digital Payment, Insurance,Virtual Wallet & Cards
Website: Design, Build, Maintain & Update
Mobile Apps: iOS & Android
Medical: Diagnostic & Hospital Management Platform
Landing Page Creation
Intersoft is a global IT service provider with offices in India, Japan, Malaysia, Singapore, Taiwan, United Arab Emirates and the United States. Our clients including Fortune 100 & 500 companies comprising a variety of industries including Manufacturing, Finance and Technology, Pharmaceuticals, as well as System Integrators.
We are Hiring - Join US
send resume to Japan.sales@intersoftkk.com
Project Manager & Program Manager
Service Delivery Manager
Business Development Manager
IT Recruiter
Network Engineer & Server Engineer
Software Developer
RAN Engineer
SAP Engineer - SD,MM, FI - CO, BASIS
Why Intersoft?
20+
Years
250+
Global Clients
300+
Employees Worldwide
20+
Nationalities

Delhi Spices

#106-13, 5 chome 20
Kitasuna, Koto-ku, Tokyo-to
136-0073. Japan

ボンゴバザール
BongoBazar
FRESH & HALAL MARKET

BONGO BAZAR】
HALAL & SUPER MART
3-208-1 Hikonari Misato-city, Saitama.
Open Every day:10:00～20:00

oryxpeer.com/about/

ORYXPEER HOME ABOUT SERVICES CAREER CONTACT US

About Us

MR. AJOY SINHA ROY, PRESIDENT

Mr. Sinha Roy has been associated in the business of consulting, planning, and recruiting for high-tech industries, for more than 35years.Having extensive industry experience, he adds substantial value to the customers in a different segment of the business.His experience fills the gap between the requirements. His attention, suggestion, alertness, market know-how satisfies confidence to the customers. He has been working with many of the same clients for more than 35years, which evaluate his engagement and commitment.

Our Core Domains

Web Technologies

HTML5, CSS, Bootstrap, JAVA, JavaScript, Python/Flask, C#.Net, Express Node JS Frameworks like React, Angular, Flask, Express JS, SpringBoot, Stacks : MEAN, MERN, LAMP

Mobile Technologies

Frameworks : Android, Flutter, ReactNative, Swift, Xcode

Database

MySQL, MongoDB

Cloud

AWS, GCP

Tools

GitHub, Redmine, Firebase, Docker/Kubernets

Methodologies

Agile/Scrum

Product Development

Whoovex : Virtual World Trade Fair

A unique virtual SaaS platform to bring together
Exhibitors – Businesses – Visitors

- Registration (visitor, business, exhibitors)
- Design my assets (digital showroom, exhibition)
- Promote your presence online
- Dashboard – exhibitions running, advertisements
- Virtual walkthrough of exhibition
- Visitor services
  - Download information, business cards
  - View presentations
  - Live chat with representatives
- Virtual Conferences
- Data Analytics

Launching soon...